লজ্জাবতী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুইটাকা

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাশ্মীর-প্রবাসী

বন্ধু ও বান্ধবী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী

করকমলেষু

দাদু, দিদি,—

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর বটে—ভালো দেখিয়াছি !
নিশৎ, নিশিম, শালিমার,
ডল-লেক, পদ্ম-বন, উলার, ঝিলাম,—
অপরূপ ছবি সুষমার !
আরো কত সুষমায়, কি যে শোভা-রূপে
পরিপূর্ণ তোমাদের মন !
ভূ-স্বর্গে করেছো স্বর্গ স্নেহ-মায়া দিয়া—
চিত্ত-বিত্ত দেখিনি অমন !
তোমাদের স্নেহ-ছায়ে হাসি-গল্প-গানে
কি আনন্দ পেয়েছি জীবনে !
সে যে ভুলিবার নয়—কভু ভুলিব না—
রেশ তার আজো জাগে মনে !
অতীত সে-সুখ স্মরি, তোমাদের দ্বারে আজি
পাঠালেম 'লজ্জাবতী' মেয়ে,
আমার স্নেহের ধন, আদরের, যতনের—
স্নেহে তারে রেখো দোঁহে ছেয়ে !

প্রীতিমুগ্ধ

শ্বিন, ১৩৩৭

সৌরীন্দ্র

লজ্জাবতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

তরুণ বয়সের বেদনা

বৈশাখের শেষ। অনিশ এবার বি-এ দিয়াছে; এবং পরীক্ষার পর এই বৈশাখেই তার বিবাহ হইয়াছে। ফুলশয্যার স্মৃতির রেশ বুকে এখনো ভরপুর!

বিজিতলার বড়-পুকুরটার পশ্চিম-কোণে সন্ধ্যায় সেদিন বন্ধুদের মজলিশ বসিয়াছিল। নিত্য এমন বসে। পড়াশুনার ঝঞ্চাট নাই,—বসিয়া সকলে কাব্য আলোচনা করে পূরাপূরি। সেদিনও তাই হইতেছিল; অনিশ শুধু তৃণশয্যায় কাৎ হইয়া শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। নব বধূর কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় শরৎ ডাকিল,—ওরে অনিশ…

এ-আহ্বানে স্মৃতির কল্পলোক হইতে দুম্ করিয়া নামিয়া অনিশ কহিল,—ডাক্‌চিস্ আমায়?

শরৎ কহিল—হ্যাঁ। কোন্ কল্পলোকে ঘুরছিলি তুই?

অনিশ একটু অপ্রতিভ হইল, কহিল,—কি যে তামাসা করিস্। কেন ডাকছিলি, বল্ না…

শরৎ কহিল—বৌকে যে চিঠি লিখেছিলি, তার জবাব এতোনী? কৈ দেখালিনে তো…

এ-কথায় অনিশের বুক এক অব্যক্ত ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। হতাশা-মিশ্রিত স্বরে সে কহিল,—চিঠির জবাব এখনো পাইনি।

বন্ধুর দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—এখনো জবাব পাস্‌নি! সে কি রে? তাদের স্বরে একরাশ বিস্ময় একেবারে উথলিয়া উঠিল।

অনিশ কহিল—না, পাইনি।

ছোট্ট জবাব! কিন্তু কতখানি মর্ম্মবেদনা ঐ ছোট্ট কথাটুকুতে।

গাছের অন্তরাল ভেদ করিয়া ওধারে চৌরঙ্গীর যে-অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, জবাব দিয়া অনিশ সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। অত্যন্ত ব্যথিত উদাস তার দৃষ্টি!

সমীর কহিল—আজ পাঁচ দিন হলো, তুই চিঠি দিয়েচিস্‌—না?

অনিশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

শরৎ কহিল,—ভবানীপুর থেকে বাগবাজারে চিঠি যেতে ক'দিন লাগে? বলিয়া অনিশের পিঠে শরৎ মৃদু একটা চড় দিল।

অনিশের অন্তরাত্মা অশ্রুর বাষ্পে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে কি তা জানে না? পোষ্ট অফিসের এ গতিটুকুর খবর সে ভালো করিয়াই জানে! কিন্তু আশা দিয়া শোভা তাকে এতখানি নিরাশ করিবে, এ তার স্বপ্নের অগোচর ছিল!

হাসিয়া কুমুদ কহিল,—বিদায়-বেলায় মান-অভিমান কিছু হয়নি তো? এ্যাঁ? বলিয়া সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিশের মুখের পানে তাকাইল।

অনিশ হাসিল—হতাশের হাসি। সে হাসিতে প্রাণের চিহ্নও নাই! শুধু হাসির কঙ্কাল! তার পর ছোট্ট একটু জবাব দিল—না। তার বুক-ভাঙ্গা একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

২ তী লক্ষ্য করিল; এবং লক্ষ্য করিয়া সমবেদনা-ভরা স্বরে

sigh! Is there anything tragic in it?

শরৎ কহিল,—তাই চিঠি ছায়নি, আর কি। কাল রাত্রে মান-অভিমানের একপালা গেয়ে নিস্, মোদ্দা! সে ভারী মজার হবে!

হাসিয়া কুমুদ কহিল,—সে আমি একবার করেছিলুম। আঃ! ওঁদের দিকে মৌনতার একটু আমেজ দিলে চোখের জলের আড়াল ভেদ করে সোহাগ-আদরের কি উচ্ছ্বাস-আবেগেই না ওঁরা অভিসিঞ্চিত করে' তোলেন···কোথায় লাগে তার কাছে ভাই এই গরমের দিনে মালাইয়ের কুলপী! সত্যি refreshing···বলিয়া সে উচ্ছ্বসিতভাবে মুক্ত হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল!

শরৎ কহিল—আমার কাণ্ড বুঝি শুনিস্ নি? বলি তবে, শোন্···

বন্ধুর দল উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শরৎ কহিল,—বিয়ের তিন মাস পরের কথা—শ্বশুরালয়ে গেছি। শান্তির সঙ্গে [illegible] রাত জাগা হয়েচে··· ভোরের দিকে শান্তি বলে বসলো—এক[illegible] [illegible]হ'লে ভারী লজ্জায় পড়তে হবে। মুখে-চোখে [illegible] [illegible]বেলায়

[illegible]

চলে

হয়ে

ভোর

লিখে

চিঠিতে

ঘুম···

তুমি

আমি

ভেঙ্গে

দিতে চায় তো তাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করো ... তা, ব্যস্‌...!

সকলে সোৎসাহে প্রশ্ন করিল—তার পর ?

শরৎ কহিল—বদমায়েসি করে আমি তো ভোরেই চম্পট দিলুম। আসবার সময় শ্বশুরের সঙ্গে দেখা...তাঁকে বললুম, একবার বেলুড়ে যেতে হবে, জরুরী কাজ আছে, তাই এখনি চললুম...এই বলে তো পলায়ন !

সমীর কহিল—বেলুড়ে সত্যিই যাস্‌নি ?

হাসিয়া শরৎ কহিল,—রাম বলো !...ভগ্নীপতির বাসায় গিয়ে ঠেলে উঠলুম। বললুম, সারা রাত জেগে থিয়েটার দেখেচি, ভারী ক্লান্ত—একটু ঘুমোবো—কেউ যেন আমায় না জাগায় !...এই বলে নিদ্রা... ঘুমও যা পেয়েছিল !—বেলা এগারোটা বাজতে উঠলুম। উঠে স্নানাহার সেরে বিকেলে বাড়ী ফিরলুম। বাড়ী ফিরে শুনি, শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসেছিল। শাশুড়ী-ঠাকরুণ লিখেচেন,—ওঁদের কে আত্মীয় এসেচেন পুরী থেকে—যাবেন পশ্চিমে, কাল ভোরেই; আমায় একবার দেখতে চান, অতএব আমায় পাঠালে ভালো হয় !...

কুমুদ কহিল—আর তোমার অমনি মধুপুর যাত্রা ?

শরৎ কহিল—তাই। গিয়ে সেদিন যখন শান্তির সঙ্গে দেখা হলো, আমি গভীর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলুম। আর শান্তির চোখে শ্রাবণের কি ধারাই যে ঝরলো ! আমার পায়ে মুখ রেখে...ওঃ—ঠিক যেন সে ...রাতের বাদল-ধারা !...আমি ? আমারো তখন করুণ-কঠিন বচনের ...স্রোত ছুট্‌লো অবিরাম !

...নেশ কহিল—এ তোমার কবিতার চরম ! এতখানি শয়তানী ? ...বেচারী !

শরৎ কহিল—তার পর তাকে বুকে নিয়ে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিলুম এবং অতঃপর মান-অভিমান নাটিকার যবনিকা পতন !

কুমুদ হাসিয়া গাহিয়া উঠিল—

মধুর মিলন,
হাসিতে মিলিল হাসি, নয়নে নয়ন !

বেদনায় ক্ষোভে অনিশের বুক হাহাকার করিয়া উঠিল। যৌবন-কাব্যে হাসি-অশ্রুর এই খেলা! আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, এরাই সার্থক বিবাহ করিয়াছে। এমনি হাস্য-কৌতুক, আদর-সোহাগ, মান-অভিমান—এ না হইলে যৌবনের উৎসব যে সম্পন্ন হয় না ! তার ভাগ্যে—মার কাছে স্পষ্টই সে শুনিয়াছে, শ্বশুর মহাশয়ও সনাতন প্রথার ভারী কদর করেন। আর এই কারণেই মার আগ্রহে, পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনিশের এখন বিবাহ হইয়াছে ! বয়স একটু বেশী না হইলে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা স্বাস্থ্যের দিক হইতে মোটেই উচিত নয়—তা ছাড়া স্বামীর চেয়ে সংসারের সহিত প্রথম বয়সে পরিচয় করানোর দিকে ঝোঁক দেওয়াই বিধেয়—অল্প বয়সের তরল আমোদে বা আবেগে সংসারে দায়িত্ব-বোধ জন্মাইতে পারে না—ইত্যাদি। নানা কথা সে বাড়ীতে পিতৃমুখে হামেশা শুনিয়াছে ! শ্বশুর মহাশয়েরও তাই মত। কাজেই তার জীবনের এই শুভলগ্নটুকু—এই সুমধুর প্রথম যৌবন—তার ভাগ্যে কি দুঃখই না সঞ্চিত আছে ! এমন বিবাহ নাই হইত ! এর চেয়ে তার কল্পনার প্রিয়া-সঙ্গ···তাহাতে ঢের আরাম ছিল ! নানা বেশে অদৃশ্যলোকবর্ত্তিনী প্রিয়াকে কল্পনা করিয়া কখনো জ্যোৎস্না-রাতে স্বপ্নময় ঘুরিয়া বেড়ানো, কখনো বিজন বনে বসিয়া মালা গাঁথা—তাহা কি বৈচিত্র্য, কি মাধুর্য্যই না ছিল ! আজ যদি সে কল্পনা সত্য হইয়া মিল

তো তার কি এ কঠিন বেশ, কি এ রুদ্র মূর্ত্তি! চারিদিকে শাসনের গণ্ডী টানা! এই বাঁধনের কষাকষির মধ্যে মানুষের প্রাণ কি কখনো আরামে বাড়িতে পারে? বিশেষ এই যৌবন-রাগদীপ্ত প্রাণ…নব-নব কুহক-স্বপ্নের রঙীন আভাস যে-প্রাণকে রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় প্রতিক্ষণে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে!

শরৎ কহিল—একটা কথা বলবি, সত্যি করে? প্রশ্ন করিয়া শরৎ অনিশের পানে চাহিল।

অনিশ কহিল,—কি?

শরৎ কহিল—বৌয়ের সঙ্গে তোর আলাপ বেশ নিবিড় রকমের হয়েচে তো?

অনিশ কহিল—তা ভাই, এক রকম মন্দ হয়নি বলেই মনে হয়! তবে বিঘ্নও ঘটেছিল ··

সমীর কহিল—কি বিঘ্ন?

অনিশ কহিল,—ফুলশয্যার দিন শুতে অনেক রাত হয়! শোভা ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা বলে দিলেন, ওকে আজ জাগিয়ে রাখিস্ নে রে! ওর ভারী মাথা ধরেছিল…তা—

কুমুদ কহিল—মাতৃবৎসল পুত্র সে মাতৃ-আজ্ঞা নিশ্চয় শিরোধার্য্য করেছিলেন?

অনিশ কহিল—প্রথমে আমি চুপ করে বসেছিলুম। তার পর এমন দুর্ব্বার লোভ জাগলো…শোভার মুখের ঘোমটা একটু সরে গেছলো…মুখখানির সেই অস্পষ্ট আভাস—তাকে জাগিয়ে একেবারে বুকে নিয়ে চুমুর পর চুমুতে তার মুখ ভরে দিলুম। জেগে শোভা ঘোমটা টেনে বলে উঠলো, আঃ! আমি তখন বেশ কাতর কণ্ঠেই তাকে বললুম, —আজ জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত এই যে রাত্রিটুকু…কত সাধনার রাত্রি

…যে-রাত্রির ধ্যানে আমি তন্ময় হয়ে ছিলুম,—যে-রাত্রি সুদীর্ঘ জীবনের সাধনায় আর কখনো আমরা ফিরে পাবো না…

বাধা দিয়া সমীর কহিল—গাধা কোথাকার! একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনা করছিলি! ঐ কাব্য শুনে বৌ বলেনি তো,—পুষি মেনিটারে ফেলি আসিয়াছি ঘরে? আমরা জোয়ানগুলো বুদ্ধিবৃত্তির যত দম্ভই করি, প্রথম দর্শনে ঐ ছোট্ট বৌগুলোর সামনে এমন বেকুবির পরিচয় দি ঐ বড় বড় কথা কয়ে—শুনে তারা ভড়কে গিয়ে কি যে ভাবে! ভারী artificial, theatrical ও! দুর্জ্ঞেয় রহস্য! তারা একেবারে ভড়কে যায়, নিশ্চয়…

কুমুদ কহিল—কখনো না। আমি সাক্ষী দিতে পারি। প্রথম দর্শনে আমার প্রথম কথা,—তুমি রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থ পড়েচো? মানসী? সোনার তরী? চিত্রাঙ্গদা?

সমীর কহিল—তিনি কি জবাব দিলেন?

কুমুদ কহিল,—ইস্কুলে শিশু বইখানা পড়েচি।

হাসিয়া সমীর কহিল—তবে তো তিনি সবই পড়ে ফেলেচেন! নায়ক বল্লেন,—আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি; তুমি অবসর-মত বাসিয়ো…আর নায়িকা তার জবাব দিলেন,—হুড়হুড় দুড়দুড় মেঘ ডাকিছে, মাঠ-পথ ছেড়ে লোক বাড়ী আসিছে।—একেবারে কবির লড়াই বেধে গেল, না?

কথায় কথায় সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল! শরৎ কহিল,—তুই এক কাজ কর্ অনিশ…কাল দুপুর বেলায় একবার নাহয় চেনে ারের দিকে যা…ওধারে শ্বশুর-বাড়ীর কাছাকাছি এমনি ঘুরবি, অদৃশ্যে একসময় টুক্ করে বাড়ীতে ঢুকে পড়বি,—বলবি, এধারে ঘুরিয়া, ভাই কে কেমন আছে দেখতে একবার…বুঝলি, এর বেশী বৈচিত্র্য

আর একটি কথাও তোকে বলতে হবে না—বাকীটুকু তারা বুঝে নেবে'খন···

অনিশ কহিল—হঠাৎ যাবো? সে ভাই ভারী লজ্জা করে! নাহলে ইচ্ছা খুবই হয়!

সমীর কহিল—বাগবাজারের হাওয়া ভারী ভালো রে, গোড়ায় গলদে নজীর আছে। তবে বাগবাজারে যেতে হলে ভূতে তাড়া করা চাই···

শরৎ কহিল—যাঃ, পাগলামি করিস নে! কাজের কথা হচ্ছে এখন···

সমীর কহিল,—হৃদয়-বেদনার ওষুধ বল্‌বো না কি? তা অনিশ, একটা কথা—এবং গোড়ার কথা সেটা—ঐ লজ্জাটুকু তোমায় বিসর্জ্জন দিতে হবে। প্রেম-সাধনা করতে গেলে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় এ তিন বস্তুকে ত্যাগ করতে হবে, ভাই। প্রেম কি সহজ-লভ্য ব্যাপার? গাছের পেয়ারা নয় আর দোকানের সন্দেশও নয়! মন দিয়ে তবে তাঁর মন নিতে হবে।

কুমুদ কহিল—ঠিক বলেচে সমীর। বলিয়া সে গাহিল,—

প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে?
সে যে আপনি উদয় হয়
শুভযোগ পেলে!···

বাধা দিয়া শরৎ কহিল,—তোর শ্বশুর মশায় দুপুরবেলায় বাড়ী থাকেন? না, তাঁর কোনো কাজকর্ম্ম আছে? বেরোন্ কোথাও?

অনিশ কহিল—তিনি হাইকোর্টের উকিল।

শরৎ কহিল—তবেই তো মুস্কিল। শনিবারে হাইকোর্ট বন্ধ, এজলাস বসে না।

সমীর কহিল—Ill luck ! আজ মোদ্দা গেলে পারতিস্ অনিশ···

অনিশ আর কোনো জবাব দিল না। জীবনটা এতদিন সহজ পথে বেশ চলিয়া আসিতেছিল—ছোটখাট দুঃখ-বেদনা যতই থাকুক্, তার উপর কল্পনার রঙীন আমেজ্ টানিয়া দিলেই···আর আজ ? জটিল সমস্যা আজ বেদনায় উতরোল ঝড়ের প্রবাহে দেখা দিয়াছে ! এই ঝড়ের মধ্য দিয়াই তাকে পথ করিয়া লইতে হইবে, না হইলে···

পথের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়াছে···কর্ম্মশেষে শ্রান্ত পথিকের দলও ঐ···অনিশ সেইদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কুমুদ গান ধরিল,—

আজ লো সজনি, জোছনা-তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে যাপিব দুজনে ;
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া
পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে !···

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তর্কের শেষ

অনিশের বাপ পরেশ মিত্র কারবারী লোক। সনাতন হিন্দু বলিলে যা বুঝায়, তাঁর প্রকৃতি তাই। গৃহে পর্দ্দার যেমন কড়াক্কড়, সনাতন আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠাও তেমনি সুদৃঢ়। সম্প্রতি কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম্বের গৃহে ছেলেমেয়েদের অনাচার দেখিয়া এমন আশঙ্কাও তিনি এখানে-সেখানে প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশটা এইভাবে চলিলে আর বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে বাঙালী হিন্দুর নাম বেমালুম লোপ পাইবে! তাঁর দূর-সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতির পুত্রের অন্নপ্রাশনে গিয়া তিনি দেখেন, ভদ্রঘরের মেয়েদের অনেকে জুতা-পায়ে নিমন্ত্রণে আসিয়াছে! শুধু তাই নয়, আসিয়াছে সব খোলা মোটরে। দেখিয়া রাগে তাঁর এমন শিরঃপীড়া ধরিয়া গেল যে মনের রাগ মনে চাপিয়া তখনি নিজের স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, ঐ সব অনাচারী লোকের হাওয়া গায়ে লাগিলে মন অবধি কালিতে ভরিয়া যায়।

তার উপর সামনের বাড়ীতে থাকেন এক উকিল। তাঁর মেয়েদের মধ্যে কেহ একটা পাশ করিয়া কলেজে পড়িতেছে—সাজিয়া-গুজিয়া কেহ গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যায়,—সকালে সন্ধ্যায় গৃহে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গান গায়—এই সব ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া তাঁর আপাদমস্তক যেন জ্বলিতে থাকে।

অনিশ তাঁর বড় ছেলে, ডাগর হইয়াছে। তবু তার বিবাহ দিতে তিনি নারাজ ছিলেন দু'টী কারণে—এ বয়সে একেই তো ছেলেদের মন

রমণী-সঙ্গ-লাভের জন্য লোলুপ থাকে, তার উপর তাঁর ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া একটা দিগ্‌গজ হইয়া ওঠে, ইহাই তাঁর সঙ্কল্প। এখন বিবাহ দিলে ছেলের মাথা খাওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হইবে না। তার উপর কোন্ ঘর হইতে মেয়ে আসিবে,—সে বাড়ীতে হয়তো এ-কালের এই ফিরিঙ্গি চাল ঢুকিয়াছে! ছেলের তরল মনে যদি ফিরিঙ্গিয়ানার ছোপ ধরে? বৌ লইয়া ছেলে গাড়ী চড়িয়া মাঠে হাওয়া খাইতে যাইবে, ঘোমটা খুলিয়া বৌ পিয়ানো বাজাইতে বসিবে—সকালেই হয়তো চায়ের ফরমাশ করিবে! তার চেয়ে ছেলের মোহের বয়স কাটিয়া বুদ্ধি পাকিলে তখন হিন্দুয়ানী ও স্ত্রী দুইই সে সাম্‌লাইয়া চলিতে পারিবে—এইটুকুই ছিল তাঁর মনঃপূত। কিন্তু কাণের পাশে অবুঝ গৃহিণীর দিন-রাত অনুযোগ…ঝালাপালা হইয়াই তিনি ছেলের বিবাহ-সঙ্কল্প-বিমুখতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন্। সন্ধান করিতে যেমন এই মনের মত ঘরটি পাইলেন, অমনি বিবাহ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া গৃহিণীর অনুযোগের পথ তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে গৃহিণীকে শাসাইয়া রাখিলেন, বিবাহ দিলাম বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গিয়ানার কোনো প্রশ্রয় চলিবে না। তা যদি চালাইতে চাও তো অন্য জায়গায় গিয়া…সাবধান!…তখন কোনো অনুযোগ তুলিলে আমি…ইত্যাদি।

এই বাপের কড়া শাসনের তলে মানুষ হইলেও একালের হাওয়া যে অনিশের গায়ে লাগিয়াছিল, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় অনিশের কাব্য-চর্চ্চায়। সে নিজেও কবিতা লেখে, তবে খুব গোপনে। এবং সে কবিতার খাতা তার কাপড়ের আলমারির মধ্যে জামা-কাপড়ের নীচে সতর্কভাবে লুকানো থাকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও সে ভালো করিয়া পড়িয়াছে; তাছাড়া আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও তার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ। ছদ্ম নামে তার লেখা দু-চারিটা কবিতাও হালের

প্রকাশিত একখানা মাসিকপত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। এবং বন্ধু-সম্মিলনীতে শুধু সে একা নয়, সমীর, কুমুদ, শরৎ,—এরাও রীতিমত সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকে।

এ সংবাদ গৃহে আর আগোচর ছিল না। ছোট ভাইবোনেরাও এ খবর জানে; তবে তাদের প্রতি তার নিষেধ ছিল—এ-কথা কর্ত্তার কাণে যেন না যায়! কাজেই বিবাহ করিয়া অনিশ মিত্র জীবনটাকে স্বচ্ছন্দ আরামের করিয়া তুলিতে পারিল না। সে কথার একটু আভাস একটু পূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আহারাদি সারিয়া অনিশ নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কবিতা-রচনায় মন দিল। বুকের মধ্যকার বেদনার রাশি ভাষায় মূর্ত্তি ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ভাষায়-ছন্দে বাহির হইবার জন্য বিবাদ বাধিয়া গেল,—ভাবের আবেগ-আতিশয্যে। ভাষা যদি আগে আসে তো ছন্দ অমনি অভিমানে মুখ বাঁকাইয়া কোথায় সরিয়া যায়! হতাশ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ দেওয়ালের পানে চাহিয়া চাহিয়া অনিশ লিখিল—

তোমার লিপির লাগি আমি কাতর—
ছোট্ট লিপি লিখলে নাকো তবু···
নিরাশ বুকে বইছি ভারী পাথর—
এমন ব্যথা পাইনি আমি কভু!
জ্যোৎস্না-রাতি—সারা ভুবন বয়ে
সুধার ধারায় ঢেউ ছুটেচে যেন···

কোনোমতে এ কয় ছত্র লিখিয়া আবার সে ভাষা ও মিলের সন্ধানে ডুনিয়া হাতড়াইতে লাগিল। হঠাৎ এমন সময় বাহিরে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তার মানসী-বধূ সভয়ে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! কাণ পাতিয়া সে তখন পিতার কথা শুনিতে বসিল···

ঘরের বাহিরেই ঢাকা বারান্দা। পিতা সেই বারান্দায় আহারে বসিয়াছেন। কাছে আছেন মা।

পরেশ মিত্র বলিলেন,—আমার সঙ্গে তোমাদের কি সর্ত্ত ছিল?

মা জবাব দিলেন,—ওগো, এ সর্ত্তভঙ্গ নয়। দুনিয়া তোমার রসাতলে যাবে না। হাজার হোক্, তারা মানুষ। মানুষের সাধ-আহ্লাদ থাকে, তোমার মত বিশ্বামিত্র ঋষি তো সকলে নয়···

পরেশ মিত্র কহিলেন—সে সাধ-আঁহ্লাদে জোগান দিতে হলে পরের কোথায় কি বাধে, কি অসুবিধা হয়, সেদিকেও তো নজর রাখা চাই।

মা কহিলেন,—এতে কার কোথায় বাধবে, জানিয়ে দাও···

পরেশ মিত্র কহিলেন,—এ বয়সে আমোদ-আহ্লাদের দিকে ঝোঁক দিলে ছেলের মন হাল্‌কা হয়ে পড়বে—কর্ত্তব্য স্থির রাখতে পারবে না··· তার সারা জীবনটাই মাটী হয়ে যাবে।

অম্বিকা জ্বলিয়া উঠিল,—সেই পুরোনো কথা! বৌ যেন মায়াবিনী ডাকিনী···মন্ত্র পড়িয়া তোমার ছেলের জীবনটাকে কাদার তাল রচিয়া দিবে!

মা কহিলেন—তুমি থামো। কি কথাই শিখেচো! এ বয়সে ছেলেমেয়েরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না তো কি আমোদ করবে যাট বছর বয়সে? তখন তো তিরিক্ষি মেজাজে দুনিয়াকে খোঁচাতে থাকবে—এই তুমি যেমন করচো! ছেলের বিয়ে মানুষ এই বয়সেই ভ্যায়। হাসি বলো, গল্প বলো, সবই এই বয়সে করবার কথা। সত্যি কিছু বাতে-ধরা পায়ে তেল মালিশ করাবার জন্যে কি পাকা চুলে কলপ দেওয়াবার জন্যে বাঁদীর দরকারে মানুষ বিয়ে করে না।

পরেশ মিত্র কহিলেন—পড়াশোনা আছে। এখন ছেলের পড়াশোনার সময়···

মা বলিলেন—সারা পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে চাও,···সকল দেশেই ছেলেরা লেখাপড়া করে, পাশ দেয় আবার তার সঙ্গে বিয়েও করে। ত্রিশ বছর বয়সে লেখাপড়া সাঙ্গ করে মানুষ কিছু বারো-তেরো বছরের খুকী বিয়ে করে না।

মার কথাগুলি বেশ ঝাঁজালো।

অনিশ বুঝিল, এ কথাবার্ত্তা যা চলিয়াছে, তা তাকে লইয়াই! সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গুম্ হইয়া রহিল।

মা আবার কথা কহিলেন,—তাছাড়া ওর এগজামিন হয়ে গেছে। এখন তো লেখাপড়া নেই।

পরেশ মিত্র কহিলেন—লেখাপড়া নেই, মানি। আমি ভাবচি, এ বিয়ের হাঙ্গাম চুকে গেছে, ওকে আমার সঙ্গে দোকানে নিয়ে যাবো··· নিজের হাতে সব করুক, কর্ম্মাক। কতকগুলো আর পড়ে কি দিগ্‌গজ হবে?

মা বলিলেন—কেন, এই যে তুমিই বলতে, ওর পড়ায় চাড় আছে যখন, তখন ভালো করে লেখাপড়া করুক,—বি-এ পাশ দিক, এম-এ···

পিতা কহিলেন—ভেবে দেখলুম, সে স্নবিধে হবে না। এই তো বাজার···আইন পড়ে উকিল হওয়ার মানে অভাবের গর্ত্তে ঝাঁপ খাওয়া। তার পর, ও ব্যবসাদারের ছেলে। ব্যবসা করেই খাবে। তাতে হা-অন্ন যো-অন্ন করে বেড়াতে হবে না, আর সর্ব্বনেশে ফিরিঙ্গি চালও হাড়ে হাড়ে বসতে পাবে না। ও দোকানেই বেরুক্। এখন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শাশুড়ীর দেওয়া মাছের মুড়ো খেলেই কিছু চতুর্ভুজ হয়ে যাবে না। মাছের মুড়ো খাবার ঢের সময় মিলবে পরে। মাছের মুড়ো পালাবে না তো!

মা কহিলেন,—নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথাগুলো বললে ভালো

হয় না, কি ? তুমি নিজে কত বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলে, বাবু ? যে বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল, আমার অনির তো তার চেয়ে ঢের বেশী বয়সেই বিয়ে হয়েচে।

পরেশ মিত্র কহিলেন—কালের পরিবর্ত্তনও হয়েচে তো!...তাছাড়া আমি কত শ্বশুর-বাড়ী যেতুম ?

মা কহিলেন—তা যাবে কেন ? আমি যে বিয়ের এক মাস পর থেকেই এসে এ বাড়ীতে বাঁদীগিরিতে ঢুকেচি!

তার পর কিছুক্ষণ চুপ-চাপ!...মার প্রতি ভক্তিতে তার মন একেবারে গদগদ হইয়া উঠিল। মাগো, করুণাময়ী, মমতাময়ী জননী...!

অনিশ ভাবিল, সমাজের এই কদর্য্য নিষ্ঠুরতার প্রতি গভীর-শ্লেষে খুব এক কড়া কবিতা সে লিখিবে না কি ? তার পর ঐ 'নববাণী' মাসিকপত্রে সে কবিতা ছাপাইয়া দিবে। কিন্তু কি লেখা যায় ?

একটু ভাবিয়া সে লিখিল,—

ওরে নিষ্ঠুর বাঙালী-ছেলের পিতা,
কশাইয়ের মত ছুরি চালাইয়া চাহো কাটিবারে সন্তান-মাথা...?

কিন্তু এ কি! না...প্রথম লাইনে ..এক, দুই, তিন...পনেরোটা অক্ষর; আর দ্বিতীয় লাইনে ? সে অক্ষর গণিয়া দেখে, তাই তো, এ যে চব্বিশটা অক্ষর হইয়া গিয়াছে!...চব্বিশটা কেন ? 'সন্তান'—এই একটা কথাতেই চারিটা অক্ষর! তাছাড়া 'সন্তান মাথা'—এ-কথায় সমালোচকের দল টিট্‌কারী দিবে, বলিবে, 'মড়াদাহ'-দোষ! তার পর 'পিতা'র সঙ্গে 'মাথা'র মিলটাও ভালো নয়!—পিতা'র সঙ্গে মেলে কি ? 'চিতা', 'জিতা', 'ফিতা', 'মিতা'। এইগুলাই ভালো মিল। দ্বিতীয় লাইনটা যদি লেখা যায়...

পুত্রেরে তুমি শ্মশানে দিইয়া জ্বালিবে চিতা ?

মন্দ হয় না। কিংবা,—

দরদ একটু করো পুত্রেরে, প্রাণের মিতা !

এ আরো ভালো! একটা করুণ appeal আছে!···কিন্তু 'সন্তান-মাথা'য় শ্লেষ, রাগ, প্রাণের অগ্নিদাহ···সব আছে! তাই কাটিতে মমতা হইতেছিল।···বেশ রুদ্র রস! এ-কালের বিদ্রোহের সুর! কশাই আর ছুরি—এ দু'টায় ভারী বাস্তবতা! এই কথাই তো সমস্ত দুনিয়াকে সে বলিতে চায়!

কিন্তু কল্পনার গতি থামিয়া গেল। ওধারে আবার মায়ের কণ্ঠস্বর···

মা বলিলেন—যাই হোক, অমন করে চিঠি লিখেচে বেয়ান, অনিকে একবার পাঠাবার জন্য। সত্যি জামাই হয়েচে, পাঁচজন আত্মীয়কুটুম জামাইকে দেখতেও চায়—তাদেরো তো দেখবার সাধ যায়! তোমার উঁচু মাথা তাতে হেঁট হবে না, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা গুঁড়ো হবে না গো··· বুঝলে ?

পিতা শুধু কহিলেন,—হুঁ!—কিন্তু বিয়ের আগে তোমাদের সঙ্গে কি কথা ছিল ?···

মা কহিলেন,—সেই কথাই বজায় থাকবে গো! এবারটী আমার মান রক্ষে করো···ছেলেকে কাল শ্বশুরবাড়ী যেতে দিয়ে! আর কখনো আমি বলবো না। জামাই পেয়ে তারা যেন একেবারে কুবেরের ঐশ্বয্যি পাবে, না, রাজসিংহাসনে বসবে রাজচক্করবর্ত্তী হয়ে! কুটুম্বিতা বলে একটা জিনিস আছে—না, নিজের জেদই সর্ব্বস্ব ?·· মেয়ের বিয়ে দিয়ে জেদ কত বজায় রাখো, তখন দেখবো। সত্যিই কিছু মরবো না এত রাগ্‌গির্‌!···

পরেশ মিত্র চুপ !

অনিশের বুক ছোট একটি উত্তরের প্রতীক্ষায় আকুল অধীর হইয়া রহিল।

ব্যাকুল উদ্বেগ বুকে লইয়া বহুক্ষণ কাটিল, অবশেষে পিতার কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

পিতা কহিলেন,—বেশ, তাই হবে। এবার থেকে আমার কাছে ও-সব কথা তুলো না।

মা বলিলেন,—বেশ, আমিও ছেলেকে বলে দেবো—বউ কি শ্বশুর-বাড়ীর নাম কখনো করিস্‌নে, ওঁর হুকুম। বিয়ে দিয়েচি বটে, কিন্তু বৌকে নির্ব্বাসন দিছি আমরা···

পিতা কহিলেন,—নির্ব্বাসনের কথা তো হচ্ছে না। এখন বৌকে নিয়ে মত্ত হবার বয়স নয় ছেলের। তার সামনে এখন মস্ত কর্ত্তব্য—তাকে মানুষ হতে হবে।

মা বলিলেন,—বিয়ে করলেই কারো ছেলে বন-মানুষ হয় না। কথার শ্রী ত্যাখো না ! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—চিকিৎসা করাও।

পিতা কঠিন স্বরে কহিলেন,—তাই করাবো। তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য করবো এবার থেকে·

মা কহিলেন,—তা করতে পারলে মানুষের কাছে মান-ইজ্জৎও বজায় থাক্‌বে—নইলে ঐ রকম মেজাজ হলে তোমাকেই নির্ব্বাসনের মজা টের পেয়ে বাস করতে হবে !···

তার পর আবার সব চুপ !···

অনিশ বুঝিল, সামান্য একটু তর্ক লইয়া যে কথার সূত্রপাত হইয়াছিল, তার উপসংহার ঘটিল মনান্তরে! তবু অনুমতি মিলিয়াছে। পিতা বলিয়াছেন, কাল তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হইবে! আঃ!

বুকের মধ্যে কল্পনা আবার হাসি-মুখে আসিয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিল। মনের আনন্দে অনিশ লিখিল,—

আজিকে এ রাত কাটিলে পরে
কালিকে হবে দেখা তোমার সনে—
তখন ধরিয়া তোমার করে
বুঝাবো ভালোবাসা কত এ মনে!
কেবলি জাগে বুকে তোমার হাসি,
তোমারে ধেয়ানিছে সতত মন!
কখন দেখা হবে? অমৃত-রাশি
ছানিয়া লব সখি দিয়া চুম্বন!..

এই অবধি লিখিয়া মন আবার খারাপ হইয়া গেল—শেষ ছত্রটা মিলানো যাইতেছে না। ভাবটুকু চমৎকার—চুম্বন দিয়া অমৃত ছানিয়া লইবে···কিন্তু 'সখি' কথাটা কাটিয়া দি যদি? অর্থ ঠিক থাকে, কিন্তু ভাব কেমন খঞ্জ হইয়া পড়ে।

ছানিয়া লব দিয়া এ চুম্বন!

না,—কবিতার চরণ মিলানো সহজ ব্যাপার নয়। প্রাণে ভাব আছে খুব,—কিন্তু ভাষা তেমন যুৎসই পাওয়া যায় না, এই হইয়াছে মুস্কিল! তবে অনিশ ভাবিল, এ কবিতা তো মাসিক-পত্রে পাঠাইতেছে না যে সমালোচকের দল চীৎকার করিয়া গালি দিবে! এ কবিতার পাঠক একজন—তার হৃদয়-বনের বিহঙ্গিনী শোভা! সে শুধু ভাবটাই উপলব্ধি করিবে, মিলের ঘোর-প্যাঁচ লইয়া মাথা ঘামাইবে না!···থাক, ঐ লাইনই থাক্! এটুকু তাকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, ভাবের তার অভাব নাই—আর ভাব জমাট বাঁধিলে ভাষা অমন বাঁকাচোরা হইলেও কাব্যের দর তাহাতে কমে না! একালে তাদের দলের অন্ততঃ এই মত!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ পর্ব্ব

সকালে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া অনিশ বন্ধু-গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল—আনন্দ-সংবাদ দিবার অভিপ্রায়ে। মা আসিয়া ডাকিলেন, —অনিশ···

অনিশ কহিল—কেন মা ?

মা কহিলেন,—আজ সন্ধ্যার সময় তোকে বাগবাজার থেকে নিতে আসবে। কালই কিন্তু চলে আসবি।

অনিশ কহিল,—কখন ?

মা কহিলেন,—ইনি বল্‌ছিলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই। কিন্তু তা কখনো হয় ? তা, জল-টল খেয়ে ন'টা দশটার মধ্যে আসবি। বুঝলি ?

অনিশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে। মন অপ্রসন্ন হইল —দুপুরবেলায় বধূ-সঙ্গের প্রচণ্ড অবসর—সে অবসরের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না! কিন্তু সে জানে, বাপের কাছ হইতে মা এই রাত্রিটুকুই কি যুদ্ধ বাধাইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

মা আপনার মনে বলিলেন,—খুবই খারাপ দেখাবে। কিন্তু ওঁর গোঁ! যা হোক···বলিয়া মা ছেলের পানে চাহিলেন; কহিলেন,—সে-সব কথা তুই যেন বলিস্‌নে, তারা দুঃখ কর্‌বে! বলিস্, এখানে কি দরকার আছে ওঁর—তাই বেশীক্ষণ থাকতে পারবিনে। তার পর মা আবার আপনার মনে বকিয়া চলিলেন,—বৌ নিয়ে আমোদ করবো

ভেবেছিলুম, তা এমন পোড়া অদেষ্ট করেও ভারতে এসেছিলুম—সে সাধ আমার মিটবে না !

বকিতে বকিতে মা চলিয়া গেলেন।

অনিশ কাঠ হইয়া মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, এমন প্রচণ্ড বিদ্রোহ যদি সে জাগাইয়া তুলিতে পারে—যার ফলে, কঠিন-হৃদয় বাপের মন পরাজয় মানে! কিন্তু কি করিয়া কি-বা করিবে? ভাবিয়া কোনো উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে বন্ধুদের উদ্দেশে দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

শরতের গৃহে তখন গানের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। কুমুদ হার্ম্মোনিয়মের ধারে বসিয়া গান ধরিয়াছে; আর সমীর, সুবিনয় ও পচু সকলে তারিফ করিয়া গান শুনিতেছে। অনিশকে দেখিয়া শরৎ কহিল,—কি রে, আজ যে খুব সকালেই বেরিয়ে পড়েচিস্!

অনিশ কহিল,—কাল ভাই একটা কবিতা লিখে ফেলেচি, রাত্রে বাড়ী ফিরে। সেটা একবার ভাখ্ না—যদি 'নববাণী'তে বার করা যায়!

শরৎ কহিল—দেখি!

অনিশ কবিতা দেখাইল।

পড়িয়া শরৎ কহিল,—বড্ড personal হয়ে গেছে। দু'চারটে কথা বদ্‌লে দি, আয়—তাহলেই এতে general appeal পাওয়া যাবে। তখন ছাপ্‌তে দিস্!

শরৎ কবিতার সংস্কারে মনোনিবেশ করিল, অনিশ কম্পিত-বুকে সংস্কার-কার্য্য দেখিতে লাগিল। দলের মধ্যে শরৎই কবিতা-রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তার কবিতা 'নববাণী'তে প্রতি মাসে ছাপা হয়। শুধু 'নববাণী' কেন, সহরে-মফঃস্বলে আরো তিন-চারিখানা নূতন

মাসিকপত্র তার কবিতা পাইবার জন্য প্রতিমাসে তাকে তাগিদ দেয় এবং তাদের সে তাগিদ কখনো নিষ্ফল হয় না।

কবিতার সংস্কার হইলে অনিশ খুব গোপনে শরৎকে জানাইল, আজ ওবেলায় সে বাগবাজার যাইতেছে।

শরৎ আবেগোচ্ছ্বসিত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—হুর্‌রে! তার চীৎকারে কুমুদের গান থামিয়া গেল। সকলে মুখ তুলিয়া কহিল,—কি হয়েচে? অনিশের চিঠি এসেচে? লজ্জায় অনিশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

শরৎ কহিল,—তার চেয়েও জবর খপর!

সকলে প্রশ্ন করিল,—কি?

শরৎ কহিল,—আজ ও বাগবাজার যাচ্ছে—নিমন্ত্রণ এসেচে। বলিয়াই অনিশের দিকে ফিরিয়া সুর করিয়া কহিল,—

আজু রজনী হাম্‌ ভাগ্যে পোহায়ব
পেখব পিয়া-মুখচন্দা...

অনিশ সলজ্জভাবে কহিল,—য্যাঃ—তুই ভাই ভারী এ···থাম্‌, তোর দাদা ওপরে আছেন, কি ভাববেন!

শরৎ কহিল,—কি আবার ভাববেন! দাদাও এ সংবাদ পেলে খুশী হবে। নতুন প্রণয়ীদের উপর দাদার ভারী sympathy! দাদার ছোট গল্পগুলোয় দেখিস্‌ না, তরুণদের উপর দাদার কি দরদ্‌!

শরতের দাদা সতীশ একজন নামজাদা গল্প-লিখিয়ে। তার উপর তার ছোট গল্পের বইও একখানা বাহির হইয়াছে—তাই দাদা এই দল হইতে একটু তফাতে থাকে। এ দল এখন সাধনায় রত; দাদার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া গিয়াছে। দাদা এখন পুরা-দস্তুর অথর! দু'চারিটা

সাহিত্য-সভার মিটিংয়ে ছাপানো কার্ডে নিমন্ত্রণও পায়। কাজেই দাদা এ-দলে বড় একটা ভিড়িতে আসে না।

কুমুদ কহিল,—যাক, তুই তাহলে রবিবাবুর কাব্য-গ্রন্থগুলো revise করে ফেল্‌গে যা,…আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো… অর্থাৎ মায়ার খেলাটার উপর বেশ করে চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলিস্ নে…

সমীর কহিল,—একখানা মায়ার খেলা না হয় কিনে সঙ্গে নিয়ে যাস্।

অনিশ কহিল,—হ্যাঁ, সাহিত্য-সভার মিটিংয়ে যাচ্ছি কি না!

কুমুদ কহিল,—ওরে, এ একেবারে বাণীর কমল-বনে সাক্ষাৎ দেবী বীণাপাণির চরণতলে অর্ঘ্য নিয়ে চলেছিস—হৃদয়-পাত্র-ভরা প্রেমের অর্ঘ্য …ঐ দেবীর প্রসাদ পেলে কবিতাও একেবারে চপল চরণে ললিত-নৃত্যের আসর খুলে দেবে'খন, দেখিস। শরৎটাকে দ্যাখ্‌না—আগে খালি 'পাখী', 'নদী', 'মন্দির' এই-সব কবিতা লিখতো। আর এখন পিয়া-পিরীতি-রসে মশ্‌গুল হয়ে কেবলি কবিতা চলেছে—'ফাগুন-রাতে' 'পিউ কাঁহা' 'দীর্ঘ-নিশ্বাস' এই সব। একদম্ রোমান্টিক ageএ প্রোমোশন পেয়ে গেছে।

সুবিনয় কহিল,—এই যে সুনির্দ্দিষ্টা নায়িকাকে লক্ষ্য করে যাত্রা সুরু…ত থেকে অনির্দ্দিষ্টার অলক্ষ্য ছায়াপাত!

শরৎ কহিল,—সুবিনয়টা সব সময়েই হেঁয়ালিতে কথা কবে! সুনির্দ্দিষ্ট থেকে অনির্দ্দিষ্টা কেন হবে? অনির্দ্দিষ্টার জন্য হাহাকার ক্রমে সুনির্দ্দিষ্টায় এসে মিলনানন্দে পরিণত হয়, এইটেই হলো ভাবের স্বাভাবিক গতি!

সুবিনয় কহিল,—কখনো না। আপনাকে সুনির্দ্দিষ্টার গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখলে কল্পনার গতি অচিরে মন্থর হয়ে পড়বে। তা ঠিক নয়।

সুনির্দ্দিষ্টা থেকে অনির্দ্দিষ্টার দিকে ঝোঁক দিলে হৃদয়-ক্ষেত্রের প্রসার বাড়ে।

শরৎ কহিল,—ও-সব বাজে কথা এখন থাক্। ওকে পরামর্শ দেওয়া দরকার—কি করে প্রিয়ার হৃদয়-রাজ্য দখল করবে। ও নেহাৎ কাঁচা—practical exp:rience নেই তো!

কুমুদ কহিল,—শুধু কবিতা লিখে ও-জিনিস দখল করা যায় না।

সুবিনয় কহিল,—আবার শুধু সংতা, খেলনা, পুতুল, ছবি, এসেন্স, লজেঞ্জেস উপহার দিলেও দখল হয় না।

সমীর কহিল,—এ-সবের সংমিশ্রণে কতকটা সফল হওয়া যায় বটে।

শরৎ কহিল,—মূর্খ! ঘুষ দিয়ে নারীর হৃদয় লাভ করবি? নারী কি পুলিশ? তা নয়…বল্ তো অনিশ, তোর আজকের রণ-ধারা কি লাইনে চালাবি, ভেবেচিস?

অনিশ কহিল,—তা তো ভাবিনি কিছু।

সমীর কহিল,—ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

শরৎ কহিল,—তাই বটে! এ ঠিক মোটর চালানোর মত…খুব হুঁশিয়ার হয়ে ষ্টীয়ারিং হুইল ধরে চালাতে হবে। নয় তো এধারে-ওধারে প্রিয়ারা বেঁকবেনই। ঠিক সামনে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—ভারী কৌশল, ভারী কশরতের কাজ। অসীম ধৈর্য্য, আর ঠাণ্ডা মেজাজ না হলে যেমন কেউ মোটর চালাতে পারে না, প্রিয়াকে বাগিয়ে বশে আনতে হলেও তেমনি অসীম ধৈর্য্য আর ঠাণ্ডা মেজাজের প্রয়োজন। Rash drive করলে পদে পদে সাজা এবং শেষে লাইসেন্স অবধি cancelled হয়ে যাবে।

কুমুদ কহিল,—খাশা উপমা দিয়েচিস মোদ্দা, শরৎ! মোটর

চালাতে পারলে চক্ষু মুদে শোঁ-শোঁ বেগে-যাত্রা যেমন নিরাপদ-নির্বিঘ্ন হয়, প্রিয়াকে আয়ত্ত করে নিতে পারলে জীবন-পথ-যাত্রাও তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘটে।

শরৎ কহিল,—শোন্ অনিশ, প্রথমটা প্রিয়ার মনের গতি লক্ষ্য করে তোকে চলতে হবে। রাগ করে মরিস্‌নে যেন…তাতে তাঁকে যে ব্যথা দিবি, তার চতুর্গুণ ব্যথা বাজবে নিজের মনে। তা' ছাড়া তাঁর মেজাজ তোর উপর একদম্ খিচ্‌ড়ে যাবে। ভারী হুঁশিয়ার! তোকে বন্য ভল্লুক না ভেবে বসেন! মান-অভিমানের অস্ত্র ধরবিনে কি তা বলে? খুব ধরবি। তবে খুব তাগ্ বুঝে ··তাতে advance করবি খুব। কি বলবো, বল্—তোর সঙ্গে সে সময় তোর পাশে থেকে তোকে গাইড্ করতে পারলেই ভালো হতো; কিন্তু তাতে তোদের দু'জনের কেউই তো রাজী হবিনে! তা ছাড়া এ-যুদ্ধ লোকচক্ষুর অগোচরে মেঘের গোপন-অন্তরালেই প্রশস্ত। যাই হোক্, তোকে এটুকু সদুপদেশ দিচ্ছি, অধীর হয়ে একেবারেই পাততাড়ি গুটোবার চেষ্টা করিস্‌নে—তাহলে সারাজীবন পস্তাতে হবে!

কুমুদ কহিল,—মানে, নারীর হৃদয়-জয় যতখানি শক্ত ব্যাপার মনে হয়, ততখানি শক্ত তা মোটেই নয়—এটুকু সর্ব্বক্ষণ খেয়ালে রাখবি।

সমীর কহিল,—তা বলে চা-পানের মত সহজ ব্যাপারও নয়। ওকে কেউ misdirect করিস্‌নে মোদ্দা…

এমনি কোলাহল-কলরবের মধ্যে অনিশের মন অত্যন্ত কাতর পীড়িত হইয়া উঠিল। কোনো রকম উপদেশ গ্রহণের জন্য সে এখানে আসে নাই। সে আসিয়াছিল, শরতের দু'টো পরামর্শ চাহিতে। এমন কথাও সে ভাবিয়াছিল, আজ শরতের কাছে অকপটে বাড়ীর কথা সে খুলিয়া

বলিবে। স্পষ্টই বলিবে, পিতার দরদ-হীন কঠিন আদেশ,—আর অন্তরালে মার বিনয়-ভরা কোমল প্রশ্রয়!—এই কথাটাই শরৎকে বলিয়া সে তার পরামর্শ চায়।...

বিদ্রোহ তো হাতে আছেই। কিন্তু বিদ্রোহ না তুলিয়া কোনমতে দু'দিক সামলানো যায় কি না...অর্থাৎ গৃহে বিদ্রোহের ধ্বনি না তুলিয়া, নিজের কোথাও আস্বচ্ছন্দ্য না জাগাইয়া কি করিয়া এই নব-রচিত পথে জীবন-যাত্রা শুরু করা যায়...সে বিষয়ে শরৎ কোনো রকম সাহায্য করিতে পারে কি না...তার জন্যই মন তার আকুল, অধীর হইয়া রহিয়াছে। বন্ধুদের মধ্যে শরৎই যা হৃদয়-বেদনার উপর সমবেদনার একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে পারে। বাকীরা? শুধু হাস্য-কৌতুক লইয়া আছে। নেহাৎ ছ্যাবলা! কিন্তু এরা এখানে যে-রকম আস্তানা পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে, চট্ করিয়া উঠিবে কি? অথচ দুপুরবেলায় নিজের বেশভূষা, এবং অপর আয়োজনও করিবার আছে! সে সময় তার আসা চলে না! উপায়?...

উপদেশ-বাণে জর্জ্জর হইয়া অনিশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—তোমরা তাহলে বসো ভাই, আমি আসি।

সমীর কহিল—এর মধ্যেই খসে পড়চিস্ যে?

অনিশ কহিল—বাড়ীতে একটু বিশেষ কাজ আছে...

কুমুদ কহিল—যা, তোকে আবার রণসজ্জা করতে হবে তো!

অনিশ কহিল—তোর সঙ্গে আমার একটু গোপনীয় কথা ছিল রে শরৎ...

এ-কথায় সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া মৃদু হাস্য করিল।

শরৎ কহিল—কি?

অনিশ কহিল—যাক্, আর একদিন হবে'খন।

শরৎ কহিল—না, না, না, আজই বল্। নাহলে আমার অশান্তির আর অন্ত থাকবে না!

অনিশ কহিল—তবে বলি।...

বলিয়া অনিশ শরৎকে একান্তে আনিয়া কহিল,—তোর সঙ্গে পরামর্শ ছিল—কিন্তু এ-ভিড়ে দু-এক কথায় সারা যাবে না তা...তুই এক কাজ করিস যদি তো হয়...

—কি কাজ?

অনিশ কহিল—আমার বাড়ী চুপি চুপি একবার আসতে পারবি? এখন আমি তাহলে এগুই—তার পর একটু বাদে চুপি চুপি...

শরৎ কহিল—বেশ, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো। কেমন?

অনিশ কহিল—তাহলেই হবে। আমি তাহলে বেরিয়ে পড়ি এখন—কিন্তু খুব সাবধানে—এরা যেন এ মতলবের বিন্দু-বিসর্গ না জানতে পারে!

শরৎ কহিল—তাই হবে। আমি নিশ্চয় যাবো।

অনিশ চলিয়া আসিল। এবং পরে শরৎ আসিয়া তার ঘরে দেখা দিল।

অনিশ তখন তার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিল, তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী...তার গৃহে যে বিপ্লবের হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে...পিতার নির্ম্মম আচরণ, হৃদয়হীন মনোবৃত্তি...মার অনুযোগ অনুরোধ...কোথাও কোনো গোপনতা রাখিল না।

শুনিয়া শরৎ ভাবিত হইল, এবং গম্ভীর স্বরে কহিল,—তাই তো, এ-রকমটা যে আমি কল্পনাও করিনি কখনো।

অনিশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শরতের পানে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ কি ভাবিয়া শরৎ কহিল,—আচ্ছা, আজ তোর মুখে ওদিককার রিপোর্ট আগে শুনি...তার পর পরামর্শ করা যাবে-খন। মোদ্দা, ফশ্ করে যেন

বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরিস্ নে। এই রকম আচারনিষ্ঠ কড়া মেজাজের বাপ তাহলে বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে পারেন, সেটা মোটে বাঞ্ছনীয় নয়। দুনিয়ার পথ বড় জটিল, তাই···কেতাবের হাওয়া পুরোপুরি গায়ে লাগাতে গেলে বাস্তব-জীবনে কষ্ট পেতে হয়।

অনিশ কহিল,—না, খুব strategically move করতে হবে।

শরৎ কহিল—আমারো ঐ মত।

অনিশের সমস্ত মন বেদনায় করুণ বাষ্পে একেবারে সজল হইয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে সে কহিল—জীবনের এত সাধ-আশা—সব চূর্ণ হয়ে যাবে, ভাই? মিলনের এই প্রথম মুহূর্ত্ত···প্রাণ ভরে একে উপভোগ করতে পাবো না জীবনের এই বসন্তে? এর পরে তো সংসারের ভীষণ গদ্য মাথায় ডাণ্ডশ্ মারতে থাকবে···জীবনের সরস মধুর কাব্য-সুখভোগে একেবারেই বঞ্চিত থাকবো?

শরৎ ব্যথিত হইল। সে কহিল—এখনি নিরাশ হচ্ছিস কেন? ঘটনা যদি এমনি দাঁড়ায় তো তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সে ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে সে ব্যবস্থা ঠিক কি রকম হবে, সে বিবেচনা পরে। দু'জনে মিলে একটা উপায় আবিষ্কার করবো নিশ্চয়। এখন থেকেই তা বলে তুই নিরাশ হয়ে মন খারাপ করিস নে।

অনিশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—চেষ্টা করবো।···কিন্তু একটা কথা···

—কি?

অনিশ কহিল—এ কথা আর কেউ যেন না শোনে! আমি যে কত-বড় দুর্ভাগা,, তা তুই আজ জান্‌লি! এই কাব্যচর্চ্চা, এই হাসি, গল্প—এ যে কতখানি বেদনা বুকে বয়ে আমি করি···

অনিশ একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্বশুর

শ্বশুর তারিণীচরণ বাবু হাইকোর্টের উকিল। পশার মন্দ নয়। আইনের বহুবিধ ব্যাখ্যায় সুনিপুণ হইলেও প্রাচীন আচার-প্রথার মর্য্যাদা একতিল তিনি ছাড়েন নাই। অবসর পাইলেই বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে প্রাচীন আচার-নিষ্ঠার তাৎপর্য্য আলোচনা করেন এবং এই সকল আচার-অনুষ্ঠান মানিয়াই যে হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম আজো বিপ্লবের ধাক্কায় ধ্বংস পায় নাই,—এই মূল ও সার সত্য পুনঃপুনঃ সগৌরবে প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁর গৃহে আচার-নিষ্ঠার এমন সমাদর যে পাচক ব্রাহ্মণের হাতে রন্ধনশালার চার্জ দেওয়া যাইতে পারে, এমন ধারণা এ বাড়ীর কাহারো মনে ঠাঁই পায় না। তাঁর এক জামাতা বিদেশে থাকেন। বাবাজীর প্রতি তাঁর মনের মধ্যে অনেকখানি বিমুখতা সঞ্চিত আছে! তাঁর বড় মেয়ে তার হাতে পড়িয়া জুতা-মোজা মাঝে মাঝে পায়ে দেয়, নিজে না খাইলেও বাবাজীর মুর্গির মাংস খাওয়ায় নিষেধ তোলে না,—মেয়ে চা পান করে এবং বিদেশ-বিভুঁয়ে স্বামীর হাত ধরিয়া গট্‌মট্ করিয়া মেমেদের মত বেড়াইতে তার পা এতটুকু কাঁপে না!... হাতের পাশা পড়িয়া গিয়াছে—বাবাজী পয়সা-ওয়ালা...নিষ্ফল আক্রোশে তাঁর অন্তর যেন ফুঁশিতে থাকে! বাবাজীর জন্য তাঁর বড় মাথা সমাজে যেন একটু নুইয়া রহিয়াছে! তবু যে ক্ষেত্রে মেয়ে দিয়াছেন, সেখানে জোর ফলানো চলে না; তাই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মানীর মান আগে, তার পর আত্মীয়তা কুটুম্বিতা! বড় মেয়েকে আনিবার তিনি

নামও করেন না। তবে দু' একদিনের জন্য মেয়ে-জামাই যদি তাঁর গৃহে কচিৎ কখনো আসে, তাদের বিদায় দিতেও পারেন না—ওইটাই তাঁর আচার-নিষ্ঠ মনে বেদনার কাঁটা হইয়া ফুটিয়া আছে!

পরেশ মিত্রের সঙ্গে তারিণীচরণের বহুকালের পরিচয়; দু'জনের মন একই ছাঁচে ঢালা। সেই জন্যই এ বিবাহ-বন্ধন সনাতন হিন্দু সমাজের দিক দিয়া যে ভারী সুখের হইয়াছে—এ ধারণা দুই বৈবাহিকের মনে একেবারে বদ্ধমূল।

সেদিন সন্ধ্যার পর তারিণীচরণের বসিবার ঘরে তাঁর দু'-চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের আলোচনা চলিয়াছিল একালের নব্য-তরুণদের স্বেচ্ছাচারিতা লইয়া। ছেলেগুলা একালের আবহাওয়ায় একেবারে প্রচণ্ড নাস্তিক বনিয়া উঠিতেছে, এ যে মহা-আশঙ্কা ও অশান্তির বস্তু! তারা হোটেলে নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস ও আরো যা-তা খাইয়া আস্ফালন করে, গুরুজনের মুখের উপর নানা তর্ক তোলে। অন্দরের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফাঁশাইয়া দিতে উদ্যত। গোরু, গুরু ও পূজাপার্ব্বণে শ্রদ্ধা-ভক্তির কোনো ধার ধারে না, বিলাসিতার স্রোতে এমন নির্ব্বিকারে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে যে এ-সম্বন্ধে কড়া বিধি-ব্যবস্থা অচিরাৎ প্রস্তুত না করিলে হিন্দুসমাজ উৎসন্ন যাইবে।

বাহিরে এই ঘরেই অনিশকে আনিয়া বসানো হইয়াছিল। এ কথাগুলা শুনিয়া রাগে তার হাড় অবধি ঝন্‌ঝন্ করিতেছিল। ঘরে পিতার মুখে সর্ব্বদা এই কথা,—শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছে দু'দণ্ড আনন্দ উপভোগ করিতে, এখানেও ঐ! জ্বালাতন! মানুষের মন বলিয়া কিছু নাই? সে মনগুলাকে চিরদিন পিপাসু রাখিয়া শুধু তোমাদের আচারের দড়ি-দড়া দিয়া কষিয়া তাদের বাঁধো—সমাজ একেবারে স্বর্গে গিয়া চড়িবে! সমাজ, না ছাই! রাজ্যের দূষিত বাষ্পে সমাজের প্রাণ

বিষাইয়া মারা যাইবার জো···সেদিকে হুঁশ্ নাই, অথচ বড় বড় কথা কহিয়া এঁরা সমাজের মঙ্গল-চিন্তা করিতেছেন! এ যেন ঠিক মৃত্যুর হিমস্পর্শে আচ্ছন্ন রোগীকে দোতলার ঘরে ফেলিয়া নীচেকার ঘরে বড় বড় ডাক্তারদের মোটা ফী লইয়া শলা-পরামর্শের প্রচণ্ড ঘটার মতই এক বিরাট হাস্যকর অভিনয়! রোগীর বেদনা ওদিকে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, তাকে একটু আরাম দাও, বা তার প্রতিকার করো—না, সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া মুখে চুরুট গুঁজিয়া পরামর্শ-ই চালাইয়াছ সব!···এই যে দারিদ্র্য,—অন্নদায়, কন্যাদায় প্রভৃতির চাপে আমাদের জনে-জনে দলিত পিষ্ট হইয়া মারা যাইতেছে, তাদের বুকের উপর হইতে সে ভার তুলিয়া লও তো বাপু! সে সব দিকে লক্ষ্য নাই, শুধু অমুক হোটেলের দ্বার বন্ধ করো, মুর্গীর ফাঁশি দাও, তার ডিম্ ফাটাইয়া নর্দ্দমায় ফ্যালো, টিকি রাখো···এই কথা—আর বিশ্বের আলো-বাতাস প্রাণপণে চারিধার দিয়া রুখিয়া রাখিবার ফন্দী ও ফিকির ফাঁদিতেছ অহর্নিশি! সকলে বসিয়া শুধু বাঁধনের দড়ি পাকাইতেছ! মানুষগুলা খাইয়া পরিয়া স্বচ্ছন্দ মনে একটু খেলিয়া বেড়াইয়া বাঁচুক, তা না, পদে পদে নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তাদের কোণ্‌ঠাশা করিয়া মারিতেছ! অথচ এ কথাগুলা বলিতে গেলে রাগিয়া চীৎকার করিয়া দারুণ অনর্থপাত ঘটাইবে—মহাদম্ভে বলিবে,—কি, এমন স্পর্দ্ধা, গুরুজনের মুখের উপর কথা ক'ও!

তারিণীচরণ কহিলেন,—আর একটা নতুন ধুয়ো আজ কাল উঠেচে।

বন্ধুর দল উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন,—কি ধুয়ো হে?

তারিণীচরণ কহিলেন,—ধুয়ো এই যে মেয়েদের পাঁচিলের আড়ালে রাখা মহা-অধর্ম্ম! পাঁচিল ভাঙ্গো।

পঞ্চানন ঘোষাল কহিলেন—পাঁচিল ভেঙ্গে কি করতে হবে? তাঁদের নিয়ে গিয়ে গড়ের মাঠে ছেড়ে দিতে হবে চরে বেড়াবার জন্যে?

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রসিকতার মাত্রা দেখিয়া অনিশ রাগে গুম্ হইয়া উঠিল।

তারিণীচরণ কহিল,—হাসির কথা নেহাৎ নয় হে ভায়া। ক্যালকাটা কর্পোরেশন থেকে এক ফতোয়া জাহির হয়েচে যে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় আর দেওয়ালের আড়ালে থেকে থেকে বাঙালী ঘরের মেয়েরা যক্ষ্মারোগে মারা যাচ্ছে একে একে।

পশুপতি চক্রবর্ত্তী হুঁকায় চরম টান্ দিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন,—সেকালে যক্ষ্মারোগ ছিল না তো! আরে, ও-রোগের কথা যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদেও আছে। তবে···? সেকালে তবু পর্দ্দার আঁট কত কড়া ছিল। এখনকার মেয়েরা দিব্যি গঙ্গাস্নানে চলেছে, থিয়েটারে যাচ্ছে, রেলে চড়ে দেশ-বিদেশে বেড়াচ্ছে। সেকালে এত যক্ষ্মারোগ ছিল না, একালে এত বাড়লো, এর কারণ কি···? বলিয়া তিনি সকলের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে একবার চাহিলেন, তার পর হুঁকায় মুখ ও মন অর্পণ করিলেন।

সকলে মহা-আস্ফালন-ভরে গর্জ্জিয়া উঠিল—হ্যাঁ,—তার কারণ?

গজপতি কহিলেন,—এর কারণ, সংযমের অভাব, বিলাসিতার অতি বাড়। মেয়েরা এখন বিবাহ হবামাত্র একেবারে বাবাজীদের বিলাসের পুতুল হয়ে উঠেচেন। চারিদিকে এমন ব্যভিচার আর পাপ যে, বুকে হাঁফ ধরে তা দেখে! তাছাড়া আমাদেরো যেমন সংযম নেই, তাঁদেরও তেমনি—

ঘৃণায় অনিশের মন ভরিয়া গেল! এই বুড়ার দল এমন ইতর আলোচনাও জানে! মুখে কোন কথা বাধে না—তা যত ইতর হোক,

বা বিমূঢ়ই হোক! নারীর উপর এতটুকু সম্ভ্রম নাই, নিজেরা নারীকে কি হীন চক্ষেই না দেখেন! নারী, না, রাক্ষসী!…লক্ষ্মীর মত আসনে,… নয়তো নারী-রূপা ভগ্নীর মত পাশে মহা-সমাদরে বসাইয়া একালের ছেলেরাই যা নারীকে তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে শিখিয়াছে।

নকুড় শীল কহিল,—আমার ভাইপোর কথা বলচি…সংসারে আমাদের স্ত্রী, বোন, মা সকলেই রান্নাঘরে রান্নাবান্নার কাজ করে। সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে সকলের পরিচর্য্যা শেষ করে তবে স্বামীর কাছে আসে—তা কি কচি বৌঝি, কি দু-তিনটী ছেলের মা অবধি। কিন্তু এই ভাইপো বাবাজী বৌকে সর্ব্বক্ষণ নির্লজ্জভাবে নিজের ঘরে নিজের কাছে আটকে রাখে—দু'টিতে চব্বিশ ঘণ্টা মুখোমুখি বসে আছেন… বাইরে বেরুবার সময় বৌ সঙ্গে চললো! আর রান্নাঘর? সেধারে ঘেঁষতেও দেয় না—বলে, ও-সব দাসী-চাকরের কাজ—বাড়ীর বৌ…সে কেন করবে? পয়সা আছে, ও-সব কাজের জন্য দাসী-চাকর রাখবো, তারা করবে, বৌ তাদের কাজের তদ্বির করবে, সে-কাজের উপর নজর রাখবে—বৌ নিজে হেঁশেলে ঢুকে নিত্য দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে যাবে কি দুঃখে? আমার বৌ-ঠাকরুণ আমার কাছে সেদিন কত দুঃখ করছিলেন। সন্ধ্যায় বৌমাকে নিয়ে বাবাজীর আমার রোজ গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাওয়াটুকু কিন্তু ঠিক আছে—এতটুকু বেটাইম হবার জো নেই!

মুখখানাকে যথাসম্ভব প্যাঁচার মত প্যাঁচালো করিয়া পঞ্চানন কহিলেন—দেখুন দিকিনি, হিঁদুর ঘরে অনাচার!

পশুপতি কহিলেন—ঐ যে কি বইয়ে পড়েছিলুম,—বৌ হেঁশেলে ঢুকলে বাবুদের প্রণয় নাকি চিড় খায়, এ যে তাই হে।

রাগের আগুনে অনিশ গুমিয়া পুড়িতে লাগিল। শ্বশুর-গৃহে

আসিয়াছে কি ইহাদের এই-সব বিমূঢ় ইতর আলোচনা শুনিবার জন্য? শোভার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রাণ তার গভীর আগ্রহে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতেছে, অথচ সেদিকে ইঁহাদের কাহারো খেয়াল নাই! এইখানে এই অর্ব্বাচীন বুড়ার দলে কাঠের পুতুলের মত তাকে বসাইয়া রাখিয়াছে! এক-একবার তার এমনও মনে হইতেছিল, উঠিয়া যেদিকে দু' চক্ষু যায়, বাহির হইয়া পড়ে! এমন অভদ্র বেয়াদব! জামাই বলিয়া একটু গ্রাহ্যও নাই! তোমাদের ঐ তোবড়া মুখের এই সব বাক্যামৃত পান করিতে কি তার বহিয়া গিয়াছে যে এভাবে তাকে এই কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছ! একালের সম্বন্ধে এই যদি তোমাদের ধারণা তো মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য সেকালের একটা বুড়া পাত্র ধরিয়া আনিতে পারো নাই? নাকে নস্য গুঁজিয়া তোমাদের এই রসালো আলোচনা যে হাঁ করিয়া শুনিত!

তার মনের মধ্যে একরাশ তর্ক মস্ত জাল রচনা করিতেছিল। কিন্তু এখন কি তর্ক ভালো লাগে? তর্ক করিতে বা তর্ক শুনিতে সে তো এখানে আসে নাই। তাছাড়া ইহাদের সঙ্গেও আবার মানুষ তর্ক করে কখনো?

বিধাতা বুঝি তার প্রাণের কাতরতা বুঝিয়াছিলেন, সদয় হইলেন। একটা ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, জামাইবাবুর আহার প্রস্তুত।

তারিণীচরণ কহিলেন—তবে আর কি! এসো হে পঞ্চানন, তাহলে ওঠো সকলে—

ভৃত্য সবিনয়ে জানাইল, আর কাহারো খাওয়ার কথা তো বলিয়া পাঠান নাই! সে আয়োজনও—

তারিণীচরণ কহিলেন—কেন হয় নি? বাবুরা কতক্ষণ আর বসে থাকবেন? যা, আমাদের সকলেরই ঐ সঙ্গে ঠাঁই করে দিতে বল্‌গে··

ভৃত্য চলিয়া গেল।

অনিশ তেমনি বসিয়া রহিল। তাহাকে কেহ যাইতে আর বলে না! শ্বশুর মহাশয় বন্ধুদের সঙ্গে আবার আলোচনার হারানো খেই ধরিয়া কথা জুড়িয়া দিলেন। ক্ষোভে অনিশের দুই চোখে জল যেন ঠেলিয়া আসিল। এ কি ত্রিশঙ্কুর দশায় তাকে ফেলিলে, ভগবান! অন্দর হইতে ডাক যদি আসিল, সে ডাকও······

আশ্চর্য্য লোক এই শ্বশুর-মহাশয়টি! জামাইয়ের উপর তাঁর দরদের অন্ত নাই! অথচ উপায়ই বা কি? সে একেবারে অচেনা জায়গায় অসহায়ের মত পড়িয়া আছে। নূতন জামাই ··কাহারো সঙ্গে আলাপ নাই। কি করিবে, কি করা উচিত, তার কিছু না বুঝিয়া সে একান্ত বিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নকুড় শীল কহিলেন,—বাবাজীকে ডাকতে এলো। ঠাঁই হয়ে গেছে, চাকর বলে গেল। মেয়েরাও তো বসে আছেন···

তারিণীচরণ অনিশের পানে চাহিলেন, কহিলেন—তোমার খিদে পেয়েছে নাকি বাবাজী?

কি প্রশ্ন! এ প্রশ্নের কি কোনো জবাব আছে? না, নূতন জামাই এ প্রশ্নের জবাবে বলিবে, হাঁ মশায়, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে! রাগও প্রকাশ করা চলে না। কাজেই সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তার মনে যা হইতেছিল, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব!

নকুড় শীল কহিলেন—মেয়েরা ওঁকে কাছে বসে খাওয়াবেন—নতুন জামাই···

তারিণীচরণ কহিলেন—তা হলে লজ্জায় ওর খাওয়াই হবে না। তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে বসে খেলে তবু কিছু খেতে পারবে। কি

বলো হে পশুপতি ? আমরাও তো একদিন নতুন জামাই হয়ে শ্বশুর-বাড়ী গেছলুম—এঁ্যা !

পশুপতি কহিলেন—তা ঠিক। তবে, বাবাজী কি বলেন ?···

গজপতি কহিলেন—ওঁকে খেতেই পাঠাও হে মেয়েদের এ হলো একটা সাধের বস্তু···জামাইকে কাছে বসিয়ে খাওয়ানো !

তারিণীচরণ হাঁকিলেন,—ভোলা

ভৃত্য ভোলা আসিল। তারিণীচরণ কহিলেন—জামাইবাবুকে নিয়ে যা · ঠাই হয়েচে, বললি না ?

ঘাড় নাড়িয়া ভৃত্য জানাইল, হাঁ।

তারিণীচরণ কহিলেন,—তবে ! তুমি তাহলে ওঠো বাবাজী। ওরে ভোলা, জামাইবাবুকে নিয়ে যা···

অনিশ জেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এবার তবু আশা হইল, যে, আহারাদির পর তাহা হইলে শোভা

উঠিয়া সে ভৃত্যের অনুগমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিলন-যামিনী

অন্দরে ঢুকিতেই এক বর্ষীয়সী বিধবা অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—এসো দাদা, ওপরে এসো আমার সঙ্গে। ওপরেই খাবার দেওয়া হয়েচে।

দোতলার দালানে আসিয়া অনিশ দেখে, মস্ত আয়োজন। প্রকাণ্ড শ্বেত-পাথরের বগীতে লুচি, পোলাও, তার চারিদিক ঘিরিয়া আছে পাতে নানা ব্যঞ্জন। মাছের একটা মুড়া বাটীর মধ্যে কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে—ঠিক যেন সমুদ্রের তীরে ডোবা জাহাজের অর্দ্ধেকখানা! অনিশ ভাবিল, সদরে জামাইকে যত উপেক্ষাই দেখানো হোক, অন্দরে নারীর শাসন-প্রথা অব্যাহত আছে!

আহারাদি কোনোরকমে সুসম্পন্ন হইলে এই বর্ষীয়সীই তাকে সঙ্গে করিয়া শয়ন-গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন; এবং পানের ডিবা তার হাতে দিয়া কহিলেন—নাও দাদা, তুমি ততক্ষণ পানের জাঁবর কাটো, আমি শোভাকে খাইয়ে-দাইয়ে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

বর্ষীয়সী চলিয়া গেলেন।

একধারে খাটে বিছানা। ফুলের গন্ধ···চাহিয়া অনিশ দেখে, খাটের ছত্‌রীতে এক-হার ফুলের মালা জড়ানো রহিয়াছে! মেঝেয় ঢালা বিছানা ছিল। মুখে পান পুরিয়া মেঝের সেই ঢালা বিছানায় সে বসিয়া পড়িল। কিন্তু নেহাৎ বসিয়া থাকা নাকি ভালো দেখায় না—

যেন সেই কাব্যের প্রিয়ার আশায় বিরহী কাতর চিত্তে…তাই সে পরক্ষণে শুইয়া হাত-পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদিল।

চক্ষু মুদিয়া মনকে কল্পনার রথে তুলিয়া সে শূন্য লোকে প্রেরণ করিল। কি ভাবে আজিকার রাত্রির আলাপ সুরু করা যায়? প্রথমেই কি কথা কহিবে? চিঠির জবাব লইয়া অভিমান? কিন্তু যদি তাহাতে শোভার মন খিচ্‌ড়াইয়া যায়? না…বন্ধুরা সতর্ক করিয়া দিয়াছে। এ বড় কঠিন ব্যাপার! মন দিয়া তবে তার মন লইতে হইবে। কিন্তু তার মন দিতে কি সে বাকী রাখিয়াছে? সেই যেদিন পাকা দেখা হয় সেদিন শোভাকে না দেখিলেও সেদিন হইতেই শোভার নাম বক্ষে জপ করিতেছে! শোভাও কি তেমনি অনিশের নাম জপ-মালা করে নাই? কে জানে!…

তাই যদি তো শোভা ঘুমায় কি বলিয়া? ঘুম পায়, সত্য…তারও কি পায় না? কিন্তু নিশীথের এই অবসর…কত ক্ষুদ্র এ অবসরটুকু… তাছাড়া দু'জনের দেখাশুনার সম্ভাবনাও যখন অতি অল্প…তখন এই অবসরটুকুর পূরাপূরি সদ্ব্যবহার উচিত নয় কি? শোভাও কি এ কথা জানে না? অনিশের বুক কাঁপিতেছিল। এই সেদিন এগ্‌জামিন দিতে গিয়া ভাবিয়াছিল, না জানি, কি কতকগুলা প্রশ্ন দিবে—তার উত্তর ঠিকঠাক লিখিতে পারিবে তো? সেদিনও বুকে এমনি কাঁপুনি ধরিয়াছিল। আজো ঠিক তেমনি! এই রাত্রিটুকু—মিলনের রাগিণীতে এর প্রতি নিমেষ, প্রতি পল-বিপলটুকু যদি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে …সে সুর না কাটে...তবেই না এ রাত্রির সার্থকতা!

তার চোখের সামনে আসন্ন প্রভাত যেন তার কঠিন পরুষ মূর্ত্তি লইয়া বার-বার উঁকি দিতেছিল—রাত্রির এ বিচিত্র স্বপ্নজাল প্রভাতের সে দৃষ্টির স্পর্শে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল! কখন্ এই আধ-অন্ধকার

দু' হাতে ঠেলিয়া প্রভাত আসিয়া গলায় হাত দিয়া বলিবে, আলো, আলো, আলো ফুটিয়াছে,—সরিয়া পড়ো গো, মিলন-যামিনী শেষ! ...তোমার সুখস্বপ্ন রচনা সাঙ্গ করো—ও-সব মায়া-বিভ্রমের খেলা সরাইয়া সরিয়া যাও ··দিনের আলোয় প্রণয়-সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে আর এখানে তোমার ঠাঁই হইবে না! ঐ ছাখো, রাতের ফুল ম্লান, শুষ্ক,—রাতের মিলন-দীপটুকুও নিবিয়া শেষ হইয়াছে!...

সে শিহরিয়া উঠিল। ঐ দেওয়ালের ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রাত্রির আর কতটুকুই বা বাকী? শোভা এখনো আসে না কেন?...এরা এমন অবিচার করে কি বলিয়া? জানে তো রাত্রি শেষ হইলেই তাকে বিদায় লইতে হইবে···মিলনের জন্য দু'খানি তরুণ-চিত্ত কি অসহ্য আকুলতায় ভরিয়া রহিয়াছে · পরস্পরকে কাছে পাইবার জন্য কি তীব্র তাদের আকাঙ্ক্ষা! তবু এই সুমধুর ক্ষণটুকুতে কেন তারা ঐ সব রাজ্যের খুঁটিনাটি তুলিয়া বিচ্ছেদের বেদনায় তাদের চিত্ত কাতর, আতুর করিয়া রাখে?... না···ঐ যে দ্বারের পাশে চুড়ির টিং-টাং · কাপড়ের খশ্-খশ্ শব্দও না ঐ—

অনিশ চোখ তুলিয়া চাহিল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আপাদ-মস্তক-বস্ত্রাবৃতা শোভাকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া বাহির হইতে দ্বারটা কে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। অনিশ ভাবিল, এ স্বপ্ন? না, এ শোভা সত্যই তার সামনে! তার উদ্যত বাহুর মিলন-বন্ধনের সহজ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

চট্ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুখে মৃদু হাসি ভরিয়া শোভার পানে চাহিল; তার পর দ্বারে খিল আঁটিয়া দিল। শোভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনিশ তাকে জড়াইয়া ধরিয়া একরকম বুকে

তুলিয়াই তাকে আনিয়া খাটে শয্যায় বসাইয়া দিল। শোভা একেবারে ধনুকের মত বাঁকিয়া রহিল।

বহু মিনতি, বহু কাতর অনুনয়ের পর শোভা সোজা হইয়া বসিল। অনিশ তার মুখের ঘোমটা সরাইয়া ডাকিল—শোভা…

শোভা একবার চোখ মেলিয়া অনিশের পানে চাহিল, কহিল,—কি ?

অনিশ কহিল,—আজ তোমাদের বাড়ী কেন এসেচি, জানো ?

ঘাড় নাড়িয়া শোভা জানাইল, সে তা জানে।

আনন্দে অনিশের বুক ভরিয়া উঠিল। সে কহিল—কেন বলো দিকিনি ?

শোভা কহিল,—তোমায় যে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করা হয়েছিল।

স্বর্গ হইতে রসাতলে পতনের উপমা দু-একখানা উপন্যাসে অনিশ পড়িয়াছিল। তার আঘাত যে এমন বাজে, সেটুকু তার জানা ছিল না! শোভার উত্তরে সে কথার মর্ম্ম সে আজ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিল।

অনিশ কহিল—তা নয়। আমি এসেচি এখানে আজ তোমার জন্য। তোমায় দেখবো বলে, তোমার মুখের দু'টি কথা শুনবো বলে এসেচি।

কথাটা শোভা ঠিক বুঝিল কি না, অনিশ তা জানিতে পারিল না। সে দেখিল, শোভা মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিতেছে।

অনিশ কহিল—তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

ঘাড় নাড়িয়া শোভা জানাইল, পাইয়াছিলাম।

অনিশ কহিল,—তার জবাব দিলে না কেন ? আমি তোমার জবাবটুকুর প্রতীক্ষায় কি অধীর হয়েছিলুম! শুধু একটি ছত্র…তা লিখেও কেন আমার সে চিঠির জবাব দিলে না, শোভা ?…অনিশের স্বর কম্পিত, কাতর, করুণ।

শোভা কহিল,—বা রে, আসবার সময় তোমার মা বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি চিঠি লিখলে আমি যেন তার জবাব এখন না দি! তোমার বাবা তাতে রাগ করবেন, আর সকলে বেহায়া বলবে—

বটে! মার উপর অনিশের রাগ ধরিল। এমনি উপদেশ দিয়া বালিকা বধূর কাঁচা মনটায় তিনি ঘূণ ধরাইতেছেন! স্বামীকে পত্র লিখিবে স্ত্রী—এ তো অতি সহজ ব্যাপার···তা লিখিলে বেহায়াপনা হইবে! ওঃ!···তার মনে হইল, সে যেন পাঁচশো বছর আগেকার বাংলা দেশে বাস করিতেছে! হা ভগবান!

অনিশ কহিল,—না, সে কাজ ঠিক নয়। ও কথা তুমি শুনো না। ওঁদের এ রকম বলা অন্যায়। আমি তোমায় ঠিকানা-লেখা খাম দেবো, তাতে চিঠি পুরে পাঠিয়ো—কেউ জানতে পারবে না···এই অবধি বলিয়া সে শোভার পানে চাহিয়া রহিল, তার পর আবার কহিল,—কেমন, এবার থেকে লিখবে তো তাহলে চিঠি?

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—না!

না! অনিশ কহিল,—চিঠি লিখবে না?

শোভা কহিল,—না।

অনিশের বুকে কে যেন পাথর ছুঁড়িয়া মারিল! তার হাড়-পাঁজরা-গুলা বুঝি সে-আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে! বুক টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। অনিশ কহিল,—কেন লিখবে না, জানতে পারি?

শোভা কহিল,—এখানে বাবাও ও-সব পছন্দ করে না। বলে, শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা কখনো অমান্য করবে না। তারপর আরো বলেচে—তোমার চিঠি আসতে—যে, সেদিন মাত্র বিয়ে হয়েচে, একরত্তি মেয়ে, এখনি বরকে চিঠি লেখা কি?

চমৎকার! অনিশের চোখের সামনে হইতে চাঁদের আলো-ভরা

উজ্জ্বল দুনিয়া যেন চাকায় ভর করিয়া চলন্ত মোটরের মত গড়াইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর সে শূন্য স্থানটায় কোথা হইতে রাশি-রাশি ধোঁয়া আসিয়া জমিল—সে ধোঁয়া যেমন মিস্ কালো, তেমনি জমাট! সে ধোঁয়ার চাপে অনিশের নিশ্বাস অবধি বন্ধ হইবার জো!

অনিশ তখন বহু কাব্য, বহু উপন্যাস হইতে বহু উদাহরণ এবং বন্ধুদের জীবন হইতে বহু কাহিনী একত্রিত করিয়া শোভাকে বুঝাইতে বসিল,—এ কাজে কোথাও অন্যায় কিছু নাই। স্বামী ও স্ত্রী মিলনের প্রথম মুহূর্ত হইতেই যদি পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার অবকাশ না পায়, তাহা হইলে তাদের জীবনরই একেবারে নিষ্ফল, নিরর্থক হইয়া পড়িবে!

তবু শোভার সেই এক জবাব—চিঠি সে লিখিতে পারিবে না; লজ্জা করে! তাছাড়া বাবার কাছে···বাবা ঐ সব কারণে শোভার দিদিকে মোটেই দেখিতে পারেন না!

শোভার কথায় অনিশের চোখের সাম্‌নে সারা পৃথিবী যেন গোলার ঘা খাইয়া মুহূর্তে ফাটিয়া চুরমার হইয়া গেল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বহ্নি-জ্বালা

রিপোর্টের জন্য বন্ধুর দল উন্মুখ ছিল ; অনিশ তাদের সঙ্গেও দেখা করিল না। রুদ্ধ শাসনে হৃদয়কে নিরস্ত করিয়া সে স্থির করিল, শোভার নামও আর মুখে আনা নয়! ভিখারীর মত তার প্রাণের দ্বারে কোনো কামনা জানানো নয়। তার মন এ উপেক্ষায় শায়েস্তা হয় কি না, দেখি! একজনের এত বড় অন্যায় কথা শোভা শিরোধার্য্য করিল? আরো পাঁচজনে বিবাহ করে—শোভার চেয়ে তারা কিছু ডাগর নয়! তারা কেমন অনায়াসে স্বামীকে দরদ করে, স্বামীর কি মূল্য তা বোঝে এবং স্বামীর সুখ-দুঃখ তাদের হৃদয়কে কেমন স্পর্শ করিয়া চলে। আর শোভা?

কুশিক্ষা! কুসংস্কারের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া সে মানুষ হইয়াছে, এ কুশিক্ষার ফল তাকে পাইতেই হইবে! কিন্তু সেই সঙ্গে বেচারা অনিশ কেন কষ্ট পায়? এ তোমার কি বিধান, ভগবান! অনিশের চোখে জল আসিল।

মা আসিয়া ডাকিলেন—ওরে, খা দেখি গরম গরম শিঙাড়া করেচি···

অনিশ গর্জ্জিয়া উঠিল—ফেলে দাও গে রাস্তায়···

মা অবাক! কহিলেন—খাবিনে?

অনিশ কহিল—না। মন তার গর্জ্জিয়া উঠিল, আমার জীবনটাকে চিবাইয়া খাইয়া এখন গরম শিঙাড়া খাওয়াইতে আসিয়াছ! তোমরা

সকলে আমার শত্রু! সেই না কথা আছে, মাতা শত্রু, পিতা বৈরী! চাণক্য শ্লোকের অবশিষ্ট অংশ সে ভুলিয়া গিয়াছিল,—নহিলে মনকে বুঝাইতে পারিত, ও কোটেশন এ ক্ষেত্রে খাটে না!

স্বর আর্দ্র করিয়া মা কহিলেন—কেন খাবিনে? শরীর···

তাঁর কথা শেষ হইল না। অনিশ কহিল—হাঁ, হাঁ, শরীর আমার খারাপ। অসুখ হয়েচে···

মা কহিলেন,—দিন-কাল খারাপ পড়েচে রে! তা বাবা, জোয়ানের আরক একটু খেয়ে ফ্যাল্···

অনিশ কহিল,—খাবো'খন। তোমায় আর দরদ কর্‌তে হবে না। যাও। কাণের কাছে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে জ্বালিয়ো না!

—বাবা, কি মেজাজ! যেন গোরা! আমারো যেমন গেরো! মা বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন। অনিশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

শ্বশুরবাড়ী হইতে আবার নিমন্ত্রণ আসিল,—প্রায় তিন সপ্তাহ পরে। অনিশ বলিয়া দিল,—যেতে পার্‌বো না। আমাদের ক্লাবের আজ এ্যানিভার্সারি মিটিং।

লোক চলিয়া গেলে পরক্ষণেই মনটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। কঠিন বিরূপতা বুকে লইয়া একবার গিয়া নয় শোভাকে দেখিত! তার বেদনা যদি···পরক্ষণে সুদৃঢ় ভঙ্গীতে মনকে শাসাইল,—খবর্দ্দার! মন বলিল, না হয় অভিমানের একটা তীর দিয়া শোভাকে বিঁধিয়া আসিতে! পর-মুহূর্ত্তে মনে হইল,—সে-মনে কোনো তীর বিঁধে না। মন আবার কহিল, চেষ্টা করিয়া দেখিলে পারিতে! অনিশ কহিল,—সে তীর নিজের বুকে বিঁধিয়া বুককে আরো জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে, হয়তো তার চেয়েও···

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। বেদনা যখন অত্যন্ত ঘনাইয়া আসে, খাতা খুলিয়া সে তখন কবিতা লেখে, লিখিয়া বন্ধুদের কাছে

পড়াইতে ছোটে। পড়িয়া বন্ধুরা বলে,—অনিশের কবিতায় প্রাণের বেশ স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে হে!

অনিশ কোনোমতে নিশ্বাস চাপিয়া মনে মনে বলে, না পাইবে কেন? বুকের রক্ত দিয়া যে এখন কাব্য-লক্ষ্মীর পূজা চলিয়াছে!...

বুকের রক্ত অবশেষে একটু জুড়াইবার সুযোগ পাইল। পরেশ মিত্রকে নিত্য বাক্য-বাণে কাতর, জর্জ্জরীভূত করিয়া মা বধূকে আনিলেন।

রাত্রে আবার অনিশের সঙ্গে শোভার দেখা। অনিশ গলিয়া গেল। তার চিত্তের যত কিছু কঠিন প্রতিজ্ঞা একেবারে বাসি-ফুলের মত ঝরিয়া পড়িল। অনিশ কহিল—আমার জন্য মন কেমন কর্‌তো না শোভা?

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কি কঠিন মন! এই নারী? কাব্যে উপন্যাসে যে সব নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হইয়াছে, তাদের কাহাকেও সে এমন দেখে নাই!

স্বরে শ্লেষ মিশাইয়া অনিশ কহিল—এখানে এসে মন কেমন করচে খুব...তোমার বাপের বাড়ীর জন্য,—না?

শোভার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। সে কহিল—কর্‌চে।

অনিশ রাগিয়া উঠিল। কিন্তু নারীর উপর রাগ করা না কি কাপুরুষতা—সভার মিটিংয়ে দু-তিনটা প্রবন্ধে এমন কথা সে কবুল করিয়াছে, তাই রাগটাকে ফুটিতে দিল না। অনিশ কহিল—তবু এই পাঁচ ঘণ্টা এখানে এসেচো! পাঁচ ঘণ্টাতেই এত!

শোভার চোখে জল আসিল। পুঁটু, মন্তু, খুচি, কালী—এরা এখন সেখানে কি করিতেছে! মন অমনি হু-হু করিয়া উঠিল।

অনিশ ভাবিল, এই অপদার্থ বধূকে নিজের পরিচয় একবার ভালো করিয়া জানাইয়া দি, তাহা হইলে হয়তো উহার মনে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলা যাইবে এবং তার ফলে হয়তো...

অনিশ কহিল,—আমি পদ্য লিখি—জানো, শোভা! সে পদ্য কাগজে ছাপা হয়েচে। দেখবে?

কথাটা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে গিয়া চৈত্রের 'নববাণী'খানা আনিয়া নিজের লেখা কবিতা পড়িতে সুরু করিয়া দিল...

ফুলের গন্ধে বাতাস ভরেচে আজি,
পাখীর কণ্ঠে জেগেচে নূতন সুর—
হৃদয় আমার সে সুরে উঠেচে বাজি—
আসিবে অতিথি—সে ক্ষণ নহে রে দূর।

শোভার চোখের জলে চারিধার তখন ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছে—অনিশের সে দিকে লক্ষ্য মাত্র নাই। সে তার কবিতা পড়িয়া চলিয়াছে। পড়া শেষ হইলে আবেগ-ভরা কণ্ঠে কহিল,—তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা যেদিন ঠিক হলো, এ কবিতা সে দিন রাত্রে বসে লিখেচি, শোভা। এই যে অতিথির কথা রয়েচে, এ অতিথি হচ্ছো তুমি! এ কবিতার মানে এখন বুঝলে?

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা পড়া এবং এ অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া, তার দিক্ হইতে কোনো সাড়া ফুটিল না। অনিশ চাহিয়া দেখে, শোভার দুই চোখে জল! সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

নৈরাশ্যের বেদনায় অনিশের মন তখনি আহত মূর্চ্ছাতুর হইল। বই ফেলিয়া সে খোলা জানালার অন্তরাল দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। শোভা—তার বধূ এমন বিমুখ চিত্ত লইয়া স্বামীর কাছে আসিয়াছে!

সে কহিল,—আর কাঁদতে হবে না, ঘুমোওগে।...

অনিশ হাল ছাড়িয়া দিল। যার মন নাই, তার কি সে আয়ত্ত করিতে চায় ?···

পাঁচ-সাত দিন বধূ এইখানেই রহিয়া গেল। দিনের বেলায় শোভার সঙ্গে দেখা হওয়া দুর্ঘট। নানা ছলে অন্দরে ঘুরিতে আসিয়া অনিশ দেখে, যে-শোভা তার কাছে আসিবামাত্র লজ্জায় ঘুমে অমন ঢুলিয়া পড়ে, নয়তো চোখের জলে ভাসিয়া যাইবার জো হয়, সেই শোভাই মার সঙ্গে দিব্য গল্প করিতেছে, পাণ সাজিতেছে, দাসীর সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করিতেছে! ভাইবোনদের সঙ্গে ছুটাছুটি হাসি-গল্পেরও তার অন্ত নাই! তবে তো তার মন বলিয়া পদার্থ আছে! দুনিয়ার আর সকলের সঙ্গে ও মন বেশ মিশ খায়, শুধু তার বেলাতেই? অথচ, সে স্বামী, প্রাণের আপন-জন, নারীর হৃদয়-মন্দিরের উপাস্য দেবতা! এক-একবার রুদ্র গর্জ্জনে সে ঝঙ্কার তোলে, এ বিমুখতার শাস্তি যদি সে দিতে পারে,—এমন শাস্তি···যে সারা পৃথিবী সে শাস্তির তীক্ষ্ণতায় চমকিয়া ওঠে!

কিন্তু কি করিয়া. কি করিয়া · কি করিয়া এ শাস্তি দেওয়া যায়? ব্যর্থ আক্রোশে মন তার নিজের-জ্বালা আগুনে জ্বলিয়া খাক্ হইতে থাকে! বধূ ওদিকে মা-বাপের কাছে সুখ্যাতি কিনিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিনের পর দিন কাটায়।

মার মুখে বধূর প্রশংসা ধরে না! বাঙালীর ঘরে যেমন বৌ হইতে হয়! শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, তাঁদের দেখাশুনা,—ছোট ছোট দেবর-ননদের প্রতি মমতা, তাদের দেখা-শুনা···কোনো দিকে ত্রুটি নাই।

এ সুখ্যাতির কথা অনিশের কাণে যায়। রাগে সে আরো জ্বলিতে থাকে! ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া তার জন্যই তোমরা বিবাহ দিয়া বৌ আনিয়াছ? না, নিজেদের সংসারে বাঁদী আনিয়াছ? সংসারের সব

কাজ করিলেই সে চতুর্ব্বর্গ ফল পাইবে! সংসার কি আগেও ছিল না? তার বিবাহের পূর্ব্বে? তখন তোমাদের সংসারের কোন্ কাজটায় কি ত্রুটি ঘটিত, বাপু? অনিশ · তার জন্যই তো বধূ···অনিশের মনের কোন্ পিপাসা বৌ আসিয়া মিটাইয়াছে? তোমরাই তার সব,—সে কেহ নয়! অথচ .তোমরাই শাস্ত্রবাক্য তুলিয়া আস্ফালন করো, স্বামীই নারীর সর্ব্বস্ব—তার ইহকাল, তার পরকাল, তার জীবন্ত দেবতা! সে-ই দেবতার প্রতি এ-নারী তার কর্ত্তব্য কতখানি করিতেছে, সেদিকে কাহারো খেয়াল মাত্র নাই! অনিশ যেন বাণের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে—সে যেন একটা নিশ্চেতন পদার্থ, তার প্রাণ নাই, মন নাই, তার বুকের উপর দাঁড়াইয়া তোমরা তোমাদের সংসারের শত কার্য্য সারিয়া চলিয়াছ দিব্য আনন্দে, পরম নিশ্চিন্ত আরামে! আর তোমাদের এ কাজের চাপে অনিশের এই সদ্য-জাগা তরুণ মন গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া যাইতেছে, সেদিকে চাহিবার দরকার নাই?···

সেদিন মনে মনে অনিশ তার বক্তব্যটুকু গুছাইয়া বানাইয়া ভালো রকম দুরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রে বধূ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। অনিশ একখানা মোটা বহি খুলিয়া তার পাতাগুলার উপর চোখ বুলাইয়া চলিয়াছিল,···মন ছিল দ্বারের বাহিরে—বধূর পায়ের পাগল-করা বিহ্বল-করা সেই ধ্বনিটুকু কখন্ শুনা যায়, তারি প্রতীক্ষায়! শোভা আসিয়া দ্বার বন্ধ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া সে শুইতে যাইতেছিল, অনিশ ডাকিল,—শোভা···

শোভা দাঁড়াইল। অনিশ কহিল,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তোমার শোনবার অবসর হবে?

শোভা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। অনিশকে অগত্যা তখন উঠিতে হইল। পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায় তো মহম্মদকেই পর্ব্বতের

কাছে আসিতে হয়! অনিশ কহিল,—একটা বোঝাপোড়া আমি শেষ করতে চাই, শোভা…

শোভার মুখে কোনো ভাবান্তর নাই—যেন পুতুলের মুখ! সে শুধু বিস্ময়-স্তম্ভিত নেত্রে অনিশের পানে চাহিয়া রহিল।

অনিশ কহিল,—সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটী কর্ত্তব্য প্রাণ দিয়ে করবে, আর স্বামীকে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করবে, এই শিক্ষাই বোধ হয় পেয়েচো…না?

শোভা কোনো উত্তর দিল না, অবিচল দৃষ্টিতে অনিশের পানে তেমনি চাহিয়া রহিল।

অনিশ কহিল,—বাড়ীর দাসী-চাকরটার অবধি কোথায় অভাব, কি অভাব…তা বুঝে তাদের উপর তোমার দরদ হয়…আর আমি স্বামী—আমি কি চাই, আমার মনের গতি কোন্ দিকে—কি পেলে আম[illegible]নে তৃপ্ত হয়, তা জানবার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার? এ ক[illegible] এসেচো, আমি তোমায় একটি দিনও আমার মনের কোনো অভ[illegible] কোনো অভিযোগের কথা বলে জ্বালাতন করেচি, এমন অপ[illegible] তুমি নিশ্চয়ই দিতে পারবে না! নেহাৎ এই এক শয্যায় শোওয়া ছাড়া [illegible]ন্তর নেই বলেই কোনোমতে রাত্রিটুকু এখানে পড়ে বিশ্রাম করচো [illegible]রের দিন আবার শরীরে নব-শক্তি নিয়ে সংসারের কাজে নামবে [illegible]ল—এর মধ্যে আমায় জানবার কোনো কৌতূহল তোমার কখনো হয়েচে?

[illegible]গুলা বড় বড় কথা একেবারে শুনিয়া শোভা বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল[illegible] তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না। অনিশ ভাবিল, কি কঠিন এই[illegible]র মন! যৌবন কি ও-মনে এতটুকু রেখাপাত করে নাই? শোভা এমন অবিচলও থাকিতে পারে! যৌবনের চরণ-পাত

শোভার হৃদয়ে না ঘটিলেও মায়া-মমতা বলিয়া কি কিছু নাই? সত্যই কি পাষাণে ও-মন গড়িয়াছ, ভগবান!

অনিশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—বলো শোভা, আমায় তোমার কোনো প্রয়োজন নেই? বলো, আমি আজ সে কথা শুনতে চাই,—তোমার মুখে, স্পষ্ট ভাষায়! তোমার জীবনে আমি [illegible] ভার বোঝা, তোমার এমনি দুর্গ্রহ-অভিশাপের মত এসে পড়েচি যে পাশে শুয়েও কোনো দিন একটা কথা কবার সাধ হয় না? আমি দস্যু কি সাধু, সে সন্ধান নেবারও প্রয়োজন নেই? নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আমার পাশে শুয়ে ঘুমোও,—এ কথা ক্ষণেকের জন্য মনে হয় না যে, এ লোকটা যদি দস্যুর মত তোমার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়? যদি তোমার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নেয়? বলো, বলো, বলো শোভা···

কথাটা বলিয়া শোভার দুই হাত ধরিয়া সে প্রবল ঝাঁকা[illegible]ল। তার পর শোভার হাতখানা টানিয়া নিজের বুকের উপর রাখি[illegible] ভাবেগ-জড়িত কণ্ঠে কহিল,—এই বুকে হাত রেখে কিছু বুঝতে [illegible]চাইকি আগুন এ বুকে জ্বলচে? তোমায় পাবার জন্য আমার মনে [illegible] প্রচণ্ড আকুলতা?···শোভা, একবার আমার হাতে দয়া করে তুমি ধর[illegible] ছি—ধরা দিলে, বিশ্বাস করো, কোনো দিন অনুতাপ করতে হবে না [illegible] তোমার ওই মনে একটু ঠাঁই পেলে ধন্য হয়ে যাবো, শো[illegible] একটু স্নেহ, একটু মমতা, একটু দরদ—আমি তার কাঙাল হয়ে ঘুরে বে[illegible]াচ্ছি তোমার ভালোবাসা পাওয়া ··এছাড়া আর কিছু পাবার বাসনা [illegible] রাখি না, শোভা। জ্বলে যাচ্ছি, আমি জ্বলে যাচ্ছি···তোমার ভা[illegible] বাসার পিপাসায় বুক আমার শুকিয়ে রয়েচে! দাও, তোমার প্রে[illegible] অজস্র ধারার একটি বিন্দু দিয়ে আমায় বাঁচাও···না হলে আমি [illegible] যাবো, সত্য মরে যাবো···এই তোমার পায়ের কাছে পড়ে এমনি ক[illegible]

আজ, আজই···বলিতে বলিতে অনিশ শোভার পায়ের কাছে একেবারে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

শোভা যেন কাঠের পুতুল—নড়ে না, কোনো কথাও বলে না!

অনিশ ভাবিল, এ কাকুতিতেও এমন অটল রহিয়াছে! ওরে পাষাণী, ওরে নিষ্ঠুর · কিন্তু নিষ্ফল তার আক্রোশ!

অনিশ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল—বেশ, তাই হোক শোভা, তুমি তোমার সহস্র কর্ত্তব্য পালন করে সংসারে মহীয়সী আর্য্য-ললনা, ভক্তিমতী বধূ বলে ললাটে জয়-টীকা এঁটে জীবন-পথে চলে যাও—আমি সে-পথে কাঁটার মত কোথায় পড়ে আছি, আমার পানে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে! ভয় নেই, ভয় নেই, এ কাঁটা তোমার ওই রাঙা পায়ে কোনো দিন বিঁধে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে না···সে বিষয়ে তোমায় প্রচুর আশ্বাস দিচ্ছি···

কথাগুলা বলিয়া শোভার হাত ধরিয়া শয্যায় তাকে সে বসাইয়া দিল। শোভা তেমনি বসিয়া রহিল। তার পর সহসা ঘরের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া অনিশ একেবারে তেতলার ছাদে গিয়া উঠিল।

তার মাথার মধ্যে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল! আকাশে একরাশ নক্ষত্র! জ্যোৎস্নার ফিনিক্ ফুটিতেছে! দিব্য হাওয়া বহিতেছে! চারিধার নীরব, নিঝুম! যেন তার হৃদয়-ব্যথার গভীরতা অনুভব করিয়া বেদনায় সারা প্রকৃতি একেবারে থম্-থম্ করিতেছে!

সে ভাবিতেছিল, এখন সে কি করিবে? এই রাত্রির নিস্তব্ধতার য় তার এ ব্যর্থ জীবনের সমস্ত সাধ-আশায় গলা টিপিয়া হত্যা বে? ছাদ হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িবে? না···

সং সে চমকিয়া উঠিল। এ সে কি করিতে বসিয়াছে! এক কা বধূর বিমুখতার জন্য আত্মহত্যা করিবে? সাধ-আশা-ভরা

এই তরুণ প্রাণ · ? বধূ তো একটা কাঠের পুতুল···তার এত বেদনার একতিল যে বুঝিল না, সেই পুতুলের উপর অভিমান করিয়া জীবনের দীপ···ঐ প্রাণহীন অবোধ বধূর বিরূপতায় নিবাইয়া দিবে ? এমন সুন্দর পৃথিবী, এই আবেগ-চঞ্চল চিত্ত ··শোভার কোথায় কি-বা বাজিবে ? সে সংসার পাইয়াছে, শ্বশুর পাইয়াছে, শাশুড়ী পাইয়াছে। তা নয় ! তার চেয়ে···

প্রতিশোধ ! এমন একটা প্রতিশোধ লইতে হইবে, যার ফলে ঐ শোভা লুটাইয়া তার পায়ে আসিয়া পড়ে ! কিন্তু এ শোধ লইবার ঠিক উপায় কি ? তা তার জানা নাই। অথচ মনের এ গোপন বেদনা ···এ যে কাহারো কাছে প্রকাশ করিয়া পরামর্শ লওয়া চলে না ! ভিখারীর মত হেয় ঘৃণ্য হইতে হইবে !

বহুক্ষণ ছাদে বসিয়া থাকিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল, একেবারে নিজের ঘরে···আসিয়া দেখে, খাটের উপর মাথা রাখিয়া শোভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অঘোরে ঘুমাইতেছে। পা দু'খানি মেঝেয় ঝুলানো ···বসিয়া বসিয়া ঘুমে কখন্ ঢুলিয়া পড়িয়াছে ! শোভার চোখের কোণে কালির রেখা ! অশ্রুর চিহ্ন ? শোভা তাহা হইলে কাঁদিয়াছে ! অনিশের মন প্রসন্ন হইল—আমার সেই কথায় ?

না !···ঠিক ! এ বাপের বাড়ীর জন্য বেদনা একেবারে ভাদ্রের ভরা নদীর মত উথলিয়া উঠিয়াছে ! অন্য সময় বাপের বাড়ীর কথা মনেও থাকে না ! আশ্চর্য্য উপাদানে গড়া এই শোভার প্রাণ !···

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুপুরের আরাম

তরুণ মনের যত কিছু প্রীতি আর আশার কুসুমে অনিশ আপনার জীবনের পথটুকু মণ্ডিত করিয়াছিল, প্রাণের নব মাধুরী ঢালিয়া যে নিকুঞ্জ সে রচনা করিয়াছিল, সে-সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

চোখের সাম্‌নে জীবনের দীর্ঘ পথ তরুপুষ্পহীন শাহারার মূর্ত্তি ধরিয়া খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল।

শোভা মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে যায়; মাঝে মাঝে এখানে আসিয়াও থাকে। পরেশ মিত্রের নিষেধের সুকঠিন প্রাচীর গৃহিণীর তাড়নায় অটুট না থাকিলেও অনিশের তাহাতে কোনো লাভ নাই। শোভা বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মী বউ···শাশুড়ীর আঁচলের তলায় স্নেহের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং সনাতন আদর্শানুযায়ী রাত্রে সেই এগারোটা বাজিলে, সংসারের সকল প্রাণী সুষুপ্তির কোলে গা ঢালিয়া দিলে শোভা অনিশের ঘরে শুইতে আসে। অনিশ ঘরে বসিয়া এ-বই খোলে, ও-বই দেখে, খাতা পাড়িয়া কবিতা লেখে; এবং যে-সব ব্যাপারে কোনো দিন এতটুকু মনোযোগ অর্পণ করিতে পারিত না, সেই সব কাজ লইয়াই সে মনকে ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়াস পায়। খপরের কাগজ সে কখনো পড়িত না—যেন বিষ!—এখন দিবারাত্র সে খপরের কাগজ পড়ে। বিশ্বের সব খপর এখন তার কণ্ঠস্থ! কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, পঁচিশ টাকা বেতনে কোন্ ইস্কুল এম্-এ পাশ হেডমাষ্টার চায়; কোন্ মেম্‌সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিতেছে বলিয়া তার কয়লার টুক্‌রি, লোহার হাতা,

একটু চটা-ওঠা টিনের ম্যগ, ছেঁড়া জুতা শস্তা দামে বেচিয়া যাইতে চায়; সেণ্টপীটর্শবার্গে কোন্ জঙ্গলের ধারে কে লিভারপুলবাসী কাঁকড়া ধরিতে গিয়া শেয়ালের কামড় খাইয়া হাসপাতালে পড়িয়া আছে ··এ সব খপর এখন তার নখদর্পণে!

শোভা আসিয়া মাথার ঘোম্‌টা একটু সরাইয়া কোনো দিন হয়তো তাঁকে বলে,—অনেক রাত হয়ে গেছে, শোবে না?

অনিশ হতাশ নিরুপায় চোখেঁ প্রাণের অসহ্য কাতরতা ঢালিয়া শোভার পানে চায়, করুণ স্বরে বলে,—আমার কাছে একটু বসো না, শোভা···

শোভা শিহরিয়া জবাব দেয়,—না, তাহলে উঠতে বেলা হয়ে যাবে। মা কাল ভোরেই গঙ্গাস্নানে যাবেন, তাঁর মুখ-হাত ধোবার ব্যবস্থা যদি না হয়···

বুকে পাথরের বোঝা বহিয়া অনিশ শোভার পানে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তার সারা মন কি আগুনে যে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে···! কখনো মনে হয়, গভীর রাত্রে গোলদীঘির জলে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে,—সাঁতার সে জানে না, কাজেই পরের দিন তার প্রাণহীন দেহ-খানা যখন ভাসিয়া উঠিবে···! কখনো ভাবে, রেল-লাইনের উপর গিয়া লাইনে মাথা পাতিয়া শুইয়া থাকে, আর তার গায়ের উপর দিয়া প্রচণ্ড ভারী ট্রেণ চলিয়া মড়মড় শব্দে তার হাড়গুলার সঙ্গে মনটাকেও ছেঁচিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়!···নিরুপায় আক্রোশে সে ফুলিতে থাকে···হায় রে, তার পুষ্পিত সজ্জিত জীবন-কুঞ্জ এ কি প্রলয়-ঝড়ের দোলায় আজ ছিঁড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে!···

কলের মত শোভা সংসারের সব কাজ সারিয়া যায়। শ্বশুরের সেবা, শাশুড়ীকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বকার্য্যে সঙ্গদান, ছোট দেবর-ননদদের যত্ন, চাকর

দাসীর খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির···সর্ব্বদিকেই তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি! সনাতন আচারে নিষ্ঠাবান শ্বশুর বলেন—আমার মা-লক্ষ্মী! শাশুড়ী বলেন—এমন বৌ এ কালে চোখে আর দু'টী দেখলুম না। আর যার জন্য এ বৌ? অস্বস্তির ঝাঁজে সে পুড়িয়া ছাই হইতে থাকে!

অনিশের মনের মধ্যে যা কিছু হাসি-আনন্দ ছিল, ভাবের-ভাষার যে স্নিগ্ধ অমৃত-নির্ঝর—তা অনাদরে অবহেলায় শুকাইতে লাগিল।···

নববাণীতে কবিতা দিবার জন্য বন্ধুরা তাগিদ দেয়,—ম্লান হাসি হাসিয়া অনিশ বলে—আর ভাই, সাম্‌নে কর্ম্মক্ষেত্র বাবার সঙ্গে এখন দোকানে বেরুতে হচ্ছে···সে হিসাব-নিকাশের চাপে ভাবের নির্ঝর শুকিয়ে গেল!···

সমীর বলে—রাতের স্বপ্ন-জগৎ···তারি দু-চারটে ছবি হে···

মন এ কথায় হু-হু করিয়া ওঠে! কোনোমতে সে ভাব গোপন করিয়া অনিশ বলে—সারাদিন খেটে-খুটে ঘুমে চোখ এমন জড়িয়ে আসে যে স্বপ্ন-জগতের আব্‌ছায়াও মনে ফোটবার সুযোগ পায় না!···

সকলে হাসিয়া ওঠে, বলে,—সে কি হে! জাত্‌-কবি তুমি··· আর···

আর কি?···

সবটাই যে মরুভূমি!···সে মরুর মধ্যে হইতে কি ভাব সে সংগ্রহ করিবে?···

সেদিন দুপুরবেলায় মা গিয়াছিলেন কালীঘাটে; বাবা শিবপুরে কোন্ এক সাহেবের কাছে কাজের তাগিদে; অনিশ ঘরে আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, ছোট বোন্ ফুলিকে কহিল,—তোর বৌদি কি করেচে রে?

ফুলি কহিল—ডাল বাচ্‌ছে···

পকেট হইতে লজেঞ্জেস বাহির করিয়া ফুলির হাতে দিয়া অনিশ কহিল—তোর বৌদিকে বল্‌তে পারিস্‌···আমার ভারী মাথা ধরেচে? তাই একবার ··

তাই একবার···কি ? এই ছোট বোনের কাছে বলিতেও তার লজ্জা হইল। ফুলি খুশী-মনে মুখে লজেঞ্জস পুরিয়া কহিল—কি বলবো দাদা, বৌদিকে ?

দাদা ফুলির হাতে দু'টা পয়সা দিয়া কহিল,—গিয়ে চাকরদের বল্‌বি তোকে পুতুল কিনে দেবে।

ফুলির মহা-আনন্দ ! লজেঞ্জেস, তার উপর পুতুল কিনিবার পয়সা —এ তো ভাগ্যে জোটে না। দাদার কাছে বকুনিই শুধু পায়। ফুলি ছুটিয়া যাইতেছিল, দাদা ডাকিল,—ফুলি ··

ফুলি ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল—কি ?

দাদা প্রাণপণ-বলে লজ্জাকে ঠেলিয়া সরাইয়া কহিল—তোর বৌদিকে একবার ডেকে দিয়ে যা···আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে।

ফুলি বিস্ময়ে কাঠ হইয়া চকিতের জন্ম দাঁড়াইল ; পরক্ষণে লজেঞ্জেস আর পয়সার কৃতজ্ঞতা তার মনে জাগিল। সে কহিল—দি ডেকে। কথাটা বলিয়া ফুলি বিদায় লইল।

অনিশ তখন নিপুণ অভিনেতার মত মুখে যথাসাধ্য করুণ কাতর ভাব ফুটাইয়া বিছানায় পাশ ফিরিয়া কপালে হাত চাপিয়া চক্ষু মুদিল। উৎকর্ণ হইয়া রহিল·· দ্বারে কখন্ চুড়ির সুর বাজে, নয়তো আঁচলে বাঁধা চাবির রিণি-ঝিণি···

পথে এক বাসনওয়ালা বেতালা সুরে কাঁশী পিটিয়া দুনিয়ার যা-কিছু শব্দ ডুবাইয়া দিয়া চলিয়াছিল ; অদূরে আর একটা রব ফুটিতেছিল, 'ছুরি-কাঁচি শা-আ-ন্ ! · মাঝে মাঝে এক-একখানা ছ্যাকরা গাড়ী হুড়মুড়

শব্দে দৌড়িয়া চলিয়াছে···পথের ওধারকার বাড়ীর কলতলায় কে কাপড় আছড়াইয়া কাচিতেছে তার শব্দ, অনন্ত চাটুয্যের বৈঠকখানায় তাশ-খেলার প্রচণ্ড কোলাহল···কোথায় ঐ গ্রামোফোন্ বাজিতেছে · যা যা যা যা মিলি মিটি-মিশি যা···রাজ্যের যেখানে যত কলরব, সব আসিয়া কাণে বাজিতেছে—শুধু চির-আকাঙ্ক্ষিত, প্রাণের পরম সাধনার ধন, সেই চুড়ির আওয়াজ বা চাবির রিণিঝিণিটুকুরই কোনো সাড়া নাই!···

ভাগ্যে তার মাথা সত্যই ধরে নাই! ধরিলে মাথার সে যাতনার সঙ্গে মনের এ যাতনা মিলিয়া অনিশকে হয়তো নিমেষে মূর্চ্ছাতুর করিয়া ফেলিত! অনিশ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কাটাইতে লাগিল—মাঝে মাঝে এক-একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফুটিয়া ওঠে সে যেন ঝড়! ছোট প্রাণটুকু বুঝি সে নিশ্বাসের দমকে ছিট্‌কাইয়া বুকের খাঁচা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে!··

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল···শোভার দেখা নাই। অনিশ উঠিল, উঠিয়া দ্বারের কাছে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল।·· নীচে কলতলায় ঝী বাসন মাজিতেছে···কার সঙ্গে ঐ কথাও কহিতেছে।···ফুলি নীচে চাকরটার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে! রাগে অনিশের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। পয়সা লইয়াছে, সেজন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতাও নাই? এই তার বোন্! এই বয়সেই যদি এতখানি হৃদয়হীন হয় তো এর পরে···

ভাবিতে ভাবিতে রাগ বাড়িয়া উঠিল। সগর্জ্জনে আনিশ হাঁকিল, —ফুলি···

কোনো সাড়া নাই। নীচেকার তর্ক সহসা নীরব হইল। অনিশ আবার ডাকিল,—ফুলি···

ফুলি এবার জবাব দিল—যাই দাদা···

জবাবের সঙ্গে সঙ্গে ফুলি আসিয়া দেখা দিল; আসিয়া সভয়ে সসঙ্কোচে দাদার পানে চাহিল।

অনিশ কহিল—তোকে আমি কি বলেছিলুম ?...এসো এবার লজেঞ্জস চাইতে পুতুলও ভালো করে দেবো'খন...

কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে ফুলি কহিল,—বা রে, আমি বৌদিকে তখন বল্লুম তো। তা বৌদি কোনো জবাব দিলে না যে !

অনিশ খিচাইয়া উঠিল, একটু চাপা গলায় কহিল—বেশ,—বলো গে যাও আবার যে দাদার মাথা খসে' যাচ্ছে—বোধ হয়, খুব জ্বর হয়েচে। এসে একবার স্মেলিং সল্টের শিশিটা দিয়ে যেতে পারবেন না...?

ফুলি কহিল—বলচি গিয়ে...বা রে, নিজে আসবে না, আমায় শুধু শুধু বকুনি খাওয়াবে ·!

বকিতে বকিতে ফুলি চলিয়া গেল।...অনিশ দ্বারের পাশে তেম্‌নি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীচে ঐ ফুলির কণ্ঠ...

ফুলি বলিতেছে,—বা রে, যাও না বাবু...তার পর ক্ষণিক স্তব্ধতা... বুঝি, বধূ কি জবাব দিল,—অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে, শুনা গেল না! তার পর আবার ফুলির স্বর—দিয়ে এসো না—সেই মাথা ধরার শিশি গো.... আবার স্তব্ধতা! নিমেষ-পরে ফুলির কণ্ঠ—আমি পারবো না। ছেলেমানুষ আমি, শেষে হুড়মুড় করে অন্য শিশি ফেলে দি...তার পর আবার স্তব্ধতা..। ফুলিও চুপ!

রাগে অনিশের সর্ব্বাঙ্গ নিশ্‌পিশ্‌ করিয়া উঠিল।...সে ঘরে ঢুকিয়া আন্‌লা হইতে জামা টানিয়া গায়ে পরিল এবং জুতা পায়ে দিয়া দুমদাম্‌ শব্দে নীচে নামিয়া আসিল।

সিঁড়ির মুখে একতলার দালানে আসিতে দেখে, শোভা একধারে

জড়োসড়ো দাঁড়াইয়া! সে উপরে আসিতে ন—অনিশকে দেখিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছ?

অনিশ কহিল, – শ্মশানে। বলিয়া সে দাঁড়াইল, এবং পকেট হইতে নিজের চাবির রিংটা লইয়া ছুড়িয়া শোভার দিকে ফেলিল, কহিল,—তোমার চাবিটা আর নিয়ে গেলুম না। যদি না ফিরি···বলিয়াই সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

শোভা সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনিশের হাত ধরিল, কহিল,—তোমার মাথা ধরেচে, ছোট্‌ঠাকুরঝি যে বল্‌লে। তা চলো, ওপরে চলো, শিশি দিয়ে আসি।···

দরদের হাওয়ায় রাগ পড়িয়া গেল। অনিশ ফিরিল এবং মন্ত্র-চালিতের মত একেবারে নিজের ঘরে আসিল। শোভা স্মেলিংশল্টের শিশি লইয়া অনিশের কপালে হাত দিল, কহিল,—কৈ, ঠাকুরঝি যে বল্‌লে, জ্বর হয়েচে···গা তো গরম নয়!

অনিশ অপ্রতিভ হইল, কহিল—গা পুড়ে যাচ্ছিল···এখন কপালে জল দিয়েচি বলে···

কথাটা মিথ্যা। কিন্তু এ-মিথ্যা না বলিলে তার সমস্ত প্ল্যান ফাঁশিয়া চূর্ণ হইয়া যায়!

অনিশ বিছানায় শুইয়া রগ টিপিয়া ধরিয়া কহিল—রগ দু'টো একেবারে খসে যাচ্ছে!···

শোভা কহিল—এই নাও শিশি, সোঁকো, মাথা ছেড়ে যাবে'খন।

অনিশ কহিল—তুমি বুঝি বসে একটু সেবা করতে পারবে না···?

দুই চোখে নিরুপায়তার করুণ দৃষ্টি মেলিয়া শোভা অনিশের পানে চাহিল, কহিল—আমার একটু কাজ আছে।

অনিশ হুঙ্কার ছাড়িল,—কিসের কাজ? কাজ ছাড়া তো দেখলুম না কখনো! কি আমার শ্রাদ্ধের আয়োজন হচ্ছে, শুনি?

শোভা ম্লান দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল—মার আজ সোমবার · হবিষ্যি করবেন। সেটা চড়িয়ে দিতে হবে। কাদু উনুনে আগুন দেছে, উনুন ধরেচে···

শোভা চলিয়া যাইতেছিল। অনিশ রাগিয়া শোভার আঁচল ধরিয়া জোরে টানিল। শোভা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অনিশ কহিল,—ধরুক উনুন! স্বামীর একটু সেবা তা বলে করতে পারবে না? উনুনটা স্বামীর চেয়েও বড়?

শোভা কোন জবাব না দিয়া অনিশের পানে চাহিয়া রহিল, তার দৃষ্টি তেমনি করুণ, ম্লান!

অনিশ কহিল—সংসারে স্বামী সবার ওপরে—এ কথা মানো?

শোভা নির্ব্বাক; কোন জবাব দিল না।

অনিশ কহিল—একটু সেবার অভাবে আমার এই মাথা ধরা মস্ত টাইফয়েডে দাঁড়ালে বেশ হয়! তোমার মনে কোনো আঘাত লাগবে না তো!

শোভা দাঁড়াইয়া নত মুখে হাতের আঙুল খুঁটিতে লাগিল।

অনিশ কহিল—এতদিন বিবাহ হয়েচে···কখনো জানতে চেয়েছো, তোমার স্বামীর মন কিসের পিপাসায় শুকিয়ে ছাই হয়ে গেল? কখনো না! অথচ বাড়ীর দাসী-চাকর অবধি কি তরকারিটুকু খেতে ভালোবাসে, সে খপর তোমার অবিদিত নয়।···এই বুঝি স্ত্রীর কর্ত্তব্য?···

কম্পিত সকরুণ দৃষ্টিতে শোভা স্বামীর পানে চাহিল—তার চোখের দৃষ্টি বার বার নত হইয়া পড়িতেছিল ·

অনিশ উঠিয়া আসিয়া শোভার হাত ধরিল, ডাকিল—শোভা···

শোভা অনিশের পানে চাহিল, চাহিয়া পরক্ষণে দৃষ্টি নামাইল।

অনিশ কহিল—আমার মন তোমায় পাবার জন্য সারাক্ষণ কি অধীর, কি ব্যাকুল যে হয়ে আছে! রাত্রে সেই এগারোটায় তুমি কাছে আসবে …তোমার ঘুম পায়, তুমি ঘুমোও…তার পর পাঁচটা বাজতে চলে যাও। সারাদিনে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই!…আমার পরিচয় নেবার কোনো সাধ মনে জাগে না? আমার সঙ্গে আলাপ, দু'টো কথা পর্য্যন্ত চাও না? এমন পাষাণ তুমি…!

অনিশ একটা নিশ্বাস ফেলিল।…

ওদিকে পথে একটা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দ্বার খোলার শব্দ হইল। এবং মার কণ্ঠস্বর—ওরে ভিখু…

—মা এসেচেন। যাই। বলিয়া করুণ দৃষ্টি অনিশের মুখে নিক্ষেপ করিয়া শোভা তার হাত ছাড়াইয়া চকিতে চলিয়া গেল।…

অনিশ কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল—সম্পূর্ণ চেতনাহীন…কে যেন তাকে মুহূর্ত্তে পাষাণে পরিণত করিয়া দিয়াছে!

একটু পরে চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে অনিশ দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে নীচে নামিয়া আসিল। মা ডাকিলেন—ওরে, শুনে যা…

তার মনের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলিতেছিল। সে আগুন স্বরে মিশাইয়া অনিশ কহিল—কেন?

মা কহিলেন—একবার আয়। মা-কালীর এই চর্ণামেত্তটুকু রে…

—আমার সময় নেই! বলিয়া শিকারীর কর-নিক্ষিপ্ত তীরের মত বেগে অনিশ বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ফুলি কহিল—দাদার যে মাথা ধরেচে মা·· দাদা বল্‌লে…

সে কথা মার কাণেও গেল না। মা ডাকিলেন,—বৌমা…

বৌমা তখন উনুনে পিতলের হাঁড়ি চাপাইয়া তার মধ্যে জল ঢালিতেছে।

মা আসিয়া কহিলেন—ও বাড়ীর হাবুর মা আর তাঁর বোন…এঁরাও আমার সঙ্গে এখানে হবিষ্যি করবেন্। তুমি মা আর চাট্টি চাল বার করে ধুয়ে হাঁড়িতে দাও…তোমার হাতে খেতে ওঁদের কোনো বাধা নেই, বলেচেন।

বৌমা পিতলের সরা হাতে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া চালের জালার ঢাকা সরাইল। বাহিরে মা তখন ফুলিকে ভৎর্সনা করিতেছেন,—তুই সর্ দিকিনি বাপু…এই তেতে-পুড়ে এলুম—তোর খেলনার বায়না এখন রাখ্।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জীবন-ধারা

সহসা একদিন সন্ধ্যার পর অনিশ আসিয়া মাকে কহিল,—আমি তোমাদের দোকানে বেরুতে পারবো না। ল' পড়বো, নয়তো এম-এ। লেখাপড়া শিখে ওই হিসাবের খাতার সে-সব শিক্ষা যে বিসর্জ্জন দেবো, তা হবে না।

মা কহিলেন—কে জানে, বাপু, ওঁর কি গোঁ! সত্যিই তো তিনটে পাশ করে শেষে রাজ্যের ঐ দালাল-ফোড়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো! তা, আমার মতে তো কিছু হবে না বাপু! ওঁকে বলো···

অনিশ কহিল,—বলতে হয়, তুমি বলো। আমি কাল থেকে দোকানে আর বেরুবো না। টাকা দিয়ো, কলেজে নাম লিখিয়ে আসবো।

অনিশের মন রাগে আক্রোশে গজ্‌রাইতেছিল,—সব দিক দিয়া এমন দাসত্ব—কেন সে সহিবে? লেখাপড়া ছাড়িয়া কারবারে ঢোকো—সে কথা অমনি শিরোধার্য্য করিল! ভাবিয়াছ, দেবী সরস্বতীর কমল-সরোবরে গা ভাসাইতে গেলে বধূই যেন মায়াবিনী জোটে-বুড়ী হইয়া পায়ে শিকল আঁটিয়া জলের তলায় টানিয়া ডুবাইবে, পড়ার বই ছাড়িয়া মন কেবলই ঐ বধূর আশে-পাশে ঘুরিতে থাকিবে! এই মস্ত দুর্ভাবনার দায় এড়াইবার জন্যই না লক্ষ্মী ছেলের মত পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেবী সরস্বতীর কমল-বনের পথ ছাড়িয়া টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব-অরণ্যে বোঁ করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে তিল মাত্র সে দ্বিধাবোধ করে

নাই। তা সে পথেও যখন আরাম পাইবার উপায় নাই, তখন মিছামিছি এ ঝক্কি সে মাথায় বহে কেন? কিসের জন্য সে এতখানি দাসত্ব স্বীকার করিবে?

মাকে কথাটা বলিয়া দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে সে গিয়া দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকিল। ঘরের মধ্যে শোভা তখন বালিশে ধোপ্‌দোস্ত ওয়াড় পরাইতেছিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। শোভার মাথায় ঘোম্‌টা নাই··· নিবিষ্ট মনে বসিয়া সে কাজ করিতেছিল। ঘোমটা-খোলা মুখ দেখিয়া অনিশের তপ্ত মন চকিতে শীতল হইল। মুখে মৃদু হাসির রেখা আঁকিয়া অনিশ শোভার পাশে বসিয়া পড়িল, বসিয়া শোভার হাত দু'খানা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, কহিল,—এই তো, আজ আর তোমার হাত ছাড়ছি না, আমি। ঘোমটা-খোলা মুখখানি দেখতে পেয়েচি, আমার কত সাধের, কত সাধনার বস্তু···আজ প্রাণ খুলে দেখবো ও-মুখ···

লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া শোভা তার হাত সরাইয়া লইল, কহিল— আঃ, ছাড়ো। এখনি কে দেখতে পাবে···

কথাটা বলিয়া শোভা ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া গায়ের কাপড় সম্বৃত করিয়া কহিল,—তুমি এখন এ ঘরে বসবে···?

ক্ষোভে অনিশের মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—না···আমি এখনি চলে যাচ্ছি। ভয় নেই। তুমি বসে বালিশে ওয়াড় পরাও—স্বর্গে দেবতারা দীপমালা সাজিয়ে বসে আছেন, গৃহ-লক্ষ্মীর আরতির জন্য। আমি কোথাকার হতভাগা···আমার ঠাঁই কি এখানে হতে পারে···? আমার ঠাঁই পথের ধুলোয়!···

কথাটা বলিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া দুর্জ্জয় গোঁ-ভরে অনিশ দ্রুত

ঘরের বাহির হইয়া গেল ; বাহির হইয়া একেবারে পথে !···শোভা ঘরের মধ্যে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।···

সহসা শাশুড়ীর আহ্বানে তার চেতনা হইল। শোভা ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। শাশুড়ী কহিলেন—অনির খাবারটা নিয়ে যাওতো মা···

শোভা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না।

শাশুড়ী কহিলেন,—নিয়ে যাও···তোমায় তো আর বসে খাওয়াতে হবে না। খাবার দিয়ে তুমি চলে এসো। হ্যাঁ, তোমার বালিশে ওয়াড় পরানো হয়েচে তো ?

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—এতক্ষণ তবে···? এই অবধি বলিয়াই শাশুড়ী চুপ করিলেন, তার পর কহিলেন,—অনি ঘরে গেল বলে তুমি চলে এসেচো বুঝি ? তা সে থাকে থাক্ না···তুমি একধারে বসে ওয়াড়গুলো পরিয়ে ফ্যালো গে। আজ আবার সত্যনারাণ, ভট্‌চায্যি মশাই ঠিক আট্‌টার সময় আসবেন, বলে পাঠিয়েচেন। তার মধ্যে পূজোর সব উয্‌বুগ সারা চাই। তোমার ওদিককার কাজ চুকিয়ে গা ধুয়ে কাপড় কেচে এসো মা, ঠাকুরের শিণী তোমাকেই মাখতে হবে! ঘর-সংসারের কাজ শেখো··· বাড়ীর গিন্নী একদিন হবে তো···আমার যা জানা আছে, শিখিয়ে দিয়ে যাই।···

শোভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী কহিলেন—নাও মা, হাতের কাজ চটপট্ করে সেরে নাও। ওপরেই যাচ্ছ তো···অনির খাবারটা অমনি নিয়ে যাও।

বহু-কষ্টে লজ্জার পাশ কাটাইয়া কোনো রকমে অস্ফুট কণ্ঠে শোভা কহিল,—বাড়ী নেই।

এই একটু কথাতেই মা বুঝিলেন, অনিশ বাহির হইয়া গিয়াছে।

মা কহিলেন,—বেরিয়ে গেছে বুঝি? তা, ছেলের এদিকে সহবৎ খুব ভালো। বৌ একা বাড়ীতে, আমরা কেউ নেই—ওর বিবেচনা কত! নাহলে যে দিন-কাল পড়েচে···চারদিকে ছেলে-মেয়েদের কি বেহায়াপনা না দেখি! একেবারে যেন ফিরিঙ্গি, না, বেহ্মজ্ঞানীর ধরণ!

মা ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে কহিলেন,—তোর দাদাবাবুকে ডেকে দে তো রে!···

ভৃত্য কহিল—দাদাবাবু যে বেরিয়ে গেলেন।

মা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! সবিস্ময়ে কহিলেন,—বেরিয়ে গেছে?

ভৃত্য কহিল—হ্যাঁ।

মা কহিলেন,—কি এমন কাজ বাপু যে একটু জল খাওয়ার অবধি সময় জোটে না! ভালো জ্বালা হয়েচে আমার! আর পারি না।

আপন মনে বকিতে বকিতে মা গিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন। শোভা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, পরে দোতলার ঘরে গিয়া বালিশের ওয়াড় লইয়া বসিল।···ওদিকে পথের ওধারে এক স্যাকরার দোকানে আওয়াজ হইতেছিল,—ঠক্-ঠক্-ঠক্!··· হাতুড়ি দিয়া সোনা পিটিতেছে। শোভার মনে হইল, ঐ হাতুড়ির ঘায়ে তারো অনেকখানি সহজ আনন্দ যেন টোল্ খাইয়া তুবড়াইয়া পড়িতেছে! এ রাগ কেন? ও-কথা বলিয়া কেন সে মিছামিছি কষ্ট পায়? সে তো অগ্রাহ্য করে না! তবে ঐ সব আব্দারে তার যে বড় লজ্জা করে—ভয় হয়! পাঁচ বাড়ীর মেয়েরা আসে,—যদি কেহ দেখে তো নিন্দা করিবে,—বলিবে, কি বেহায়া বৌ গো! ছি!···রাত্রে? রাত্রে যে বড় ঘুম পায়! রাত জাগিলে সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইবে,—তা ছাড়া সারাদিন গা মাটী-মাটী করিবে!

বালিশে ওয়াড় পরাইয়া শোভা গা ধুইতে গেল, এবং গা ধোওয়া হইলে কাচা কাপড় পরিয়া পূজার উদ্যোগে মন দিল। দীপ জ্বলিতেছে, ধূপ-ধূনার গন্ধ, ফুলের টাটে একরাশ ফুল। থালায় বাতাসা। যে ক্ষুদ্র দুঃখটুকু মনের কোণে বেদনার সঞ্চার করিতেছিল, দেবপূজার আনন্দ-উৎসবের মাঝে সে-দুঃখ মুছিয়া গেল।

যথাসময়ে পুরোহিত আসিলেন। পূজা হইল। তার পর সুর করিয়া পুরোহিত কথা শুনাইতে বসিলেন। শোভা ভক্তি-ভরা চিত্তে সত্যনারায়ণের কথা শুনিতে লাগিল। সত্যনারায়ণের কি অসাধারণ শক্তি! বাবার কোপে কন্যা চন্দ্রকলা সদ্য সদ্য তার অহঙ্কারের ফল পাইল। শোভার মন বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। একটু ত্রুটিতে কি এত-বড় সাজা দিতে হয়, নারায়ণ? তুমি না দেবতা · তার পর কন্যা চন্দ্রকলা জলে ঝাঁপ দিতে চলিলেন,—নারায়ণ বিপ্রের ছদ্মবেশে আসিয়া তখন বাধা দিলেন। ছদ্ম বিপ্র কন্যা-চন্দ্রকলার পিতাকে বলিলেন,—এই যে তোমার কন্যা, রূপে গুণে মহাধন্যা, বয়োধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভালো!···কন্যার পিতা আকুল হইলেন,—বটে! উপায়?

বিপ্র বলিল,—যাও, যাও, সে শীর্ণী তুলিয়া খাও,—

পাবে পতি না কান্দ সুন্দরী।
শুনি ধনী যায় তথা, শিণী তুলে খায়; হেথা
ভেসে ওঠে পতি জলে ত্বরি।

তার পর ঠাকুরের কৃপায় সাধুর গৃহে সুখের আর সীমা রহিল না! 'শত্রুতুল্য ধনে-জনে, বাড়িলেক অল্প দিনে, পরকালে জিনিলেক যম!'

কথা সমাপ্ত করিয়া পুরোহিত বলিলেন,—এবার প্রণাম করো সকলে। বলো—

সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং প্রভুম্।
লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ ॥

শোভাও প্রণাম করিল, প্রণামের সঙ্গে প্রার্থনা জানাইল,—ও যেন আর মিছিমিছি রাগ না করে, ঠাকুর! আমার তাতে বড় ভয় করে।

শাশুড়ী কহিলেন,—শিণী সকলকে দাও বৌমা···চাকর-বাকরদের ডাকাই। সকলকে দিয়ে নিজে খাবে, বুঝলে?···

বৌমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে!···

সকলের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি চুকিতে রাত্রি এগারোটা বাজিল। মা বলিলেন,—অনি এখনো ফেরে নি? ভারী কথা-ঘঁ্যাচড়া হচ্ছে। ছ্যাখো তো, এত রাত অবধি বৌমা না খেয়ে রয়েচে! ছেলেমানুষ! না বাছা, আমি তোমার গুরুর গুরু—আমি বলচি, তুমি খাও। আমার কাছে তোমার খাবার দিয়ে যাক। বলি, ও ঠাকুরঝি, আমাদের দুই শাশুড়ী-বৌকে এইখানে তুমি খাবার দিয়ে যাও, ভাই। আমরা খেয়ে কাজ চুকিয়ে রাখি। তার পর অনি এর মধ্যে না আসে যদি তো বৌমা তার খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবে'খন!···

আহার সারিয়া ঘরে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। অনিশের এখনো দেখা নাই। শোভা জানলার ধারে বসিয়া রহিল। সারা দিনের পরিশ্রম···ঘুমে দুই চোখ বুজিয়া আসিতেছিল। জানলার কপাটে মাথার ঠেশ্ রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।···

তার পর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন পথে ভারী জুতায় খট্‌খট্ শব্দ তুলিয়া পাহারাওয়ালা চৌকিদারী করিতেছে। শোভা উঠিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। আলো জ্বলিতে খাটের দিকে চাহিল, দেখে, অনিশ অঘোরে ঘুমাইতেছে। খাবার তেমনি ঢাকা-চাপা; কেহ স্পর্শ করে

নাই। আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে আসিয়া অনিশের পায়ে মৃদু করাঘাত করিল, কহিল—শুন্‌চো…?…

বার বার সে করাঘাত করিতে লাগিল। অনিশ পাশ ফিরিয়া কহিল—কি ?

শোভা কহিল—খেলে না ? তার স্বরে লজ্জা, ভয়, উদ্বেগ একেবারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। অনিশ কহিল,—না। আমি হোটেলে খেয়ে এসেচি। থিয়েটারে গেছলুম।

কথাটা বলিয়া অনিশ পাশ ফিরিয়া পূর্ব্বের মত চক্ষু মুদিল। শোভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর আলো নিবাইয়া খাটে উঠিয়া নিজের জায়গাটিতে শুইয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল…

পরের দিন সকালে আবার সংসারের চাকা সেই নিত্যকার মত চলিতে সুরু করিল। দাসী কলতলায় বাসন মাজিতে বসিয়া বাজারের মুদির পাল্লার সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছে—গৃহিণী নীচেকার দালানে বসিয়া তৈলমর্দ্দন করিতেছেন, শোভা তাঁর সামনে বঁটি লইয়া বসিয়া গৃহিণীর নির্দ্দেশ-মত আনাজ কুটিতেছে। কর্ত্তা আসিলেই হয়, আজিকার বাজারের ফর্দ্দ তাঁর কাছে দাখিল করিয়া গৃহিণী নিশ্চিন্ত চিত্তে স্নান করিতে কল-ঘরে ঢোকেন। কর্ত্তা নিজে প্রত্যহ বাজারে যান—দু'পয়সার সুসার তাহাতে যেমন হয়, তেমনি টাটকা ভালো আনাজ-তরকারীও খাইতে পাওয়া যায়।…

সহসা সদরে পরেশ মিত্রের কণ্ঠে গর্জ্জনের সুর ফুটিল, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি মূর্ত্তিতে তিনি আসিয়া অন্দরে ঢুকিলেন। গৃহিণী গায়ে আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিলেন—কি গা ? কার সঙ্গে বকাবকি করচো ?

পরেশ মিত্র সঝঙ্কারে কহিলেন—কার সঙ্গে আবার! তোমার

গুণধর পুত্তুর! বি-এ পাশ করেচেন তো মাথা একেবারে কিনে বসেচেন —ধরাকে শরা দেখচেন!

গৃহিণী কহিলেন—কেন, কি করলে সে?

পরেশ মিত্র কহিলেন,—সকালে উঠে আমায় নুটীশ দিয়ে এসেচেন, কারবার চালানো তাঁর দ্বারা হবে না। তিনি এম-এ পড়বেন, আইন পড়বেন, পড়ে হাইকোর্টের জজ হবেন!

গৃহিণী কহিলেন—তা বাবু, ছেলে যদি লেখাপড়া করতে চায়, তাকে তা করতে দেওয়া উচিত। পড়ার দিকে ওর ঝোঁক আছে—আর ভগবানের আশীর্ব্বাদে ঘরে হাঁড়ি চড়ছে না এমন অবস্থাও যখন নয়··

পরেশ মিত্র বিরক্ত হইলেন, কহিলেন—পড়ে দিগ্‌গজ হয়ে আমার মাথা কিনবেন! পাশ-করার দলকে দেখতে তো পাচ্ছি। ফ্যা-ফ্যা! ঐ হোমরা-চোমরা যা নামেই, দু'দিন রোগে পড়্‌লে কি মুখে দেবে, তার ঠিক নেই!···এখন বাপের পয়সায় আছেন, বুঝচেন না তো, কত ধানে কত চাল! বাড়া ভাত মুখে ধরে দেওয়া হচ্ছে, তা রুচছে না! দুষ্ট বুদ্ধি আর কাকে বলে?

গৃহিণী কহিলেন,—এতেই এত রাগ করলে চলে কখনো! ডাগর ছেলে, তার একটা আব্দারও আছে তো! বিশেষ, মুখ্যু ছেলে নয়, জ্ঞান বুদ্ধি হয়েচে। তার মাথার উপর তুমি আছো, সে পর্ব্বতের আড়ালে আছে। পড়তে চাইছে, পড়ুক না। বেশ তো, আইন পাশ করতে চায় যদি, করুক—তোমার কারবারে উকীলের পরামর্শও তো নিতে হয় পয়সা খরচ করে। অনি যদি আইন পাশ করে কারবারে ঢোকে, তাতে লাভ বই লোকসান তো নেই।

পরেশ মিত্র তাচ্ছল্যের স্বরে কহিলেন—হ্যাঁ! আইন পাশ করলেই

একেবারে বি, সি, মিত্তির হয়ে যাবে! মেয়ে-বুদ্ধি আর কাকে বলে! ছেলে বুঝিয়েচে, আর তুমিও তাই বুঝে বসে আছো!

গৃহিণী কহিলেন,—আহা, তা কেন! ছেলে কিছু বোঝাতে আসেনি। আমি এমনি বলচি।

পরেশ মিত্র কহিলেন—তুমি এ-সব কথায় কথা কয়ো না! মেয়েমানুষ—অন্দরে বসে যা-খুশী করো। ডালে কতটা নুণ দেবে, ঝোলে কি মশলা দেবে···তার হিসেব তুমি রাখো,আমি তাতে কখনো কথা কইতে যাবো না। কিন্তু এ-সব ব্যাপার আমি ভালো বুঝি। আমার কি! আমি চক্ষু মুদলে কারবারটা চালাতে পারে, নিজেরাই খেতে পাবে। নাহলে আইন পাশ করে গাছ-তলায় ঘুরে বেড়িয়ে হাওয়া খেতে পারে, আর কিছু জুটবে না মুখে দিতে। আমি আছি, আমার সঙ্গে থেকে কাজ শিখে পাকা হ'—ঠক্‌বি নে···তা না, ছেলে বায়না ধরেচেন, চাঁদ নেবো! আমি তো পাগল হইনি যে সে বায়না শুনে চাঁদ পাড়তে আকাশে মই লাগাবো!···

তর্ক তুলিয়া পরেশ মিত্রের গোঁ ছাড়ানো কতখানি অসম্ভব ব্যাপার, গৃহিণী তা ভালো করিয়াই জানেন। বরং এক সময়ে ও-ধারে ছেলেকে বুঝাইয়া, এ-ধারে কর্ত্তার কাছে মিনতি তুলিয়া···তাই তিনি কহিলেন,—বেশ তো বাবু, ছেলেকে তাই বুঝিয়ে বলো। সত্যিই তো, সে ছেলেমানুষ, সংসারের কি বোঝে? তার জন্যে এই সকালেই তোমায় মাথা গরম করতে হবে না। তুমি যাও বাজারে। আজ কিন্তু মুগের ডালটা দেখে এনো। গেল-বারেরটা ভারী বিশ্রী ছিল, সেদ্ধ হতে চাইতো না। তা, মুগের ডাল পাঁচ সেরই এনো···আর দাও তো বৌমা, ফর্দ্দখানা··· সকালেই যেটা লেখালুম ··

শোভা বঁটি ফেলিয়া ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিল, এবং শেল্‌ফ হইতে একটু-

আগে-লেখা ফৰ্দ্দ আনিয়া শাশুড়ীর হাতে দিল। শাশুড়ী কহিলেন— এই নাও। ভালো কথা, কুচো চিংড়ী এনো তো গা—টুকিদের বাড়ী থেকে কাল একটা লাউ দিয়ে গেছে। বৌমা বলছিল, লাউ-চিংড়ী রাঁধবে।

পরেশ মিত্র ফৰ্দ্দ হাতে লইয়া কহিলেন,—এ একগাদা পোস্ত নিয়ে কি হবে? ধূলোর মত, না আছে স্বাদ, না কিছু···

হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন,—শোনো একবার কথা! তোমার ভালো লাগে না বলে আর কেউ খাবে না? আমাদের ভালো লাগে। তাছাড়া বিধবাদের নিরিমিষ তরকারী তো···একটু পোস্ত পেলে খায়!

পরেশ মিত্র কহিলেন—তা বলে এই আড়াই-পো?···

গৃহিণী কহিলেন—ও কি একদিনের গা! ও-পোস্ত কতদিন চলে, দেখে নিয়ো···

কর্ত্তা কহিলেন—বেশ।

ভৃত্য ধামা হাতে আসিয়া উদয় হইল, হাতে একখানা চিঠি। চিঠি গৃহিণীর নামে ডাকে আসিয়াছে। কর্ত্তা কহিল— তোমার চিঠি।

গৃহিণী কহিলেন,—থাক্, আমি তেল মেখেচি। নেবো না। বৌমার হাতে দাও।

তাই হইল। গৃহিণী কহিলেন,—কার চিঠি, বৌমা? খামটা ছিঁড়ে ছাখো তো···

শোভা খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া কহিল,—বাগবাজার থেকে এসেচে। মা লিখেচেন···

গৃহিণী কহিলেন—বেয়ান? আমায় লিখেচেন? পড়ো মা···

শোভা চিঠি পড়িল। ছোট চিঠি।·· মা লিখিয়াছেন, কর্ত্তার সেখানে খুব অসুখ চলিয়াছে আজ তিন-চার দিন। কোর্টে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন ; বারো ঘণ্টা পরে জ্ঞান হয়। প্রবল জ্বর চলিয়াছে। একরকম বেহুঁশ। কি যে হইবে, মা তো ভাবিয়া খুন। তাই যদি মত করিয়া শোভাকে একবার পাঠান্...ইত্যাদি···

গৃহিণী পরেশ মিত্রের পানে চাহিলেন, কহিলেন—শুনচো ?

পরেশ মিত্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন—হুঁ।

গৃহিণী কহিলেন—তাহলে বৌমাকে আজই তো পাঠাতে হয়। কে নিয়ে যাবে ?

পরেশ মিত্র কহিলেন—আমিই যাবো। খেয়ে নিয়ে বেরুবার সময় বৌমাকে একেবারে বাগবাজারে পৌঁছে দিয়ে তবে দোকানে আসবো। নিজেও দেখে আসবো অমনি ··

গৃহিণী কহিলেন,—অনিকেও একবার পাঠিয়ো তুমি দোকানে এসে। শ্বশুরের অমন অসুখ···কর্ত্তব্য তো ! তার উপর তোমার যদি এ বেলায় অসুবিধা বোঝো, তাহলে অনিই নয় বৌমাকে নিয়ে এবেলা যাক, তারপর তুমি নয় ওবেলায় যেয়ো···

পরেশ মিত্র কহিলেন,—না, আমিই বৌমাকে নিয়ে যাবোখ'ন !— চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হচ্ছে, আমার জানা দরকার।···অনিকে নয় ওবেলায় পাঠাবো, যদি দরকার বুঝি।

গৃহিণী কহিলেন,—সেই ভালো···কে জানে বাপু, আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল কেমন ! বেশী অসুখ নিশ্চয়—না হলে বৌমাকে পাঠাতে বলবেন কেন ?···

পরেশ মিত্র কোনো জবাব দিলেন না ; ভৃত্যকে লইয়া বাজারে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী ডাকিলেন,—বৌমা

শোভা মুখ তুলিয়া চাহিল তার চোখের কোলে জল টল্‌টল্‌ করিতেছে। গৃহিণী কহিলেন,—কেঁদো না মা। অসুখ হয়েচে, সেরে যাবে! এই যে তোমার শ্বশুরের অত বড় অসুখটা হলো···সেরে গেল না?···ভগবানকে ডাকো। তিনি ভালো করে দেবেন বৈ কি!···

নবম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র পথে

তারিণীচরণের চিকিৎসার কোন ত্রুটি ঘটিল না। দু'চার মাস এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা রক্ত ঘর্ম্ম প্রভৃতি পরীক্ষার ধূম বাধাইলেন, তার পর বিবিধ ইঞ্জেক্‌শন চলিল। খাওয়া-দাওয়া ঔষধাদির নিত্য কাটছাঁট, তবু মাসে একবার করিয়া ফিট্—তার আর বিরাম হইতে চায় না। আত্মীয়-কুটুম্বেরা এ্যালোপ্যাথিক ছাড়িয়া কবিরাজী ধরিলেন। মোটা মোটা কবিরাজ আসিলেন—চব্বিশ-পরগণা জেলার মধ্যে যেখানে যত বৈদ্য-শাস্ত্রী, সেন, রায়, গুপ্তর দল খল আর বড়ী সাজাইয়া দোকানপাট খুলিয়াছিলেন, তাঁদের কেহ আর বাকী রহিল না! তাঁরাও পাঁচন খাওয়াইয়া, নানা শিকড় বাটিয়া, পাতা ছেঁচিয়া, বড়ী গুঁড়াইয়া হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মাসে সেই যে একবার ফিট্—তা ঠিক লাগিয়াই রহিল। পরেশ মিত্রের পরামর্শে তখন উল্টাডিঙ্গি হইতে এক মোটর-চড়া ভদ্রলোককে আনানো হইল। ইনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। তিনি আসিয়া সাত-পুরুষের কার কি অভ্যাস ছিল, কার রৌদ্র সহিত, কে মিছরীর সরবৎ ভালোবাসিত, এই সব হইতে সুরু করিয়া বাড়ীর দাসী-চাকর, তারিণীচরণের মক্কেল প্রভৃতির কে কবে ক'বার হাঁচিয়াছিল, কাশিয়াছিল, চার ঘণ্টা ধরিয়া সে-সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব লইলেন। তার পর দেড় ঘণ্টা ধরিয়া পাঁচ-সাতখানা মোটা বইয়ের পাতা ঘাঁটিয়া গাড়ী হইতে ছোট কাঠের বাক্স আনাইয়া খুলিয়া ঘণ্টাখানেক তার সামনে ধ্যানস্থ রহিলেন, পরে খপ্ করিয়া একটা

ছোট শিশি তুলিয়া লইয়া কহিলেন,—বেশ মাজা পাথর-বাটীতে একটু জল···

পাথর-বাটীতে জল আনা হইলে তিনি তার ঘ্রাণ লইলেন, কহিলেন, —এ বাটী কি ব্যবহার করা হয় ?

তারিণীবাবুর এক ভাগিনেয় কহিলেন,—না। দেরাজে তোলা ছিল, ভালো করে মেজে দেওয়া হয়েচে।

ডাক্তার কহিলেন,—হুঁ ! শেষ ব্যবহার হয়েছিল কবে ?

ভাগিনেয় মেয়েদের কাছে সংবাদ জানিয়া আসিয়া কহিলেন,—তিন মাস আগে।

ডাক্তার কহিলেন,—এতে কি খাওয়া হয়েছিল ?

ভাগিনেয় সংবাদ জানিলেন, জানিয়া কহিলেন—পরমান্ন···

ডাক্তার কহিলেন,—তাতে গোলাপ জল দেওয়া হয়েছিল ?

আবার সংবাদ লওয়া হইল। এবং ভাগিনেয় কহিলেন—পরমান্নে ক'ফোঁটা গোলাপ জল দেওয়া হয়েছিল।

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার কহিলেন—এতে হবে না। অন্য বাটী দিন্—যাতে কোনো সুগন্ধির ছোঁয়াচ্ লাগেনি।

দেরাজ ঘাঁটিয়া আর একটি পাথর-বাটী আনা হইল। ভাগিনেয় কহিলেন—আন্‌কোরা বাটী···ব্যবহার হয়নি কখনো। ··

ডাক্তার তার ঘ্রাণ লইলেন। কহিলেন—মাজা হয়েচে ?···

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—আচ্ছা। বলিয়া সেই বাটীর জলে একফোঁটা ঔষধ ঢালিলেন, ঢালিয়া কহিলেন—ওঁকে খাইয়ে দিন।

আদেশ পালিত হইলে ডাক্তার রোগীর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন বহুক্ষণ।

ভাগিনেয় কহিলেন—উনি বাইরে যেতে চাইছেন। অর্থাৎ, কাশী, না হয় মুশৌরী, এমনি কোনো জায়গায়। বল্‌চেন, ঠাঁই-নাড়া হলে বোধ হয়···

ডাক্তার কহিলেন,—বেশ। আমার আপত্তি নেই।

ভাগিনেয় কহিলেন,—কিন্তু চিকিৎসা···?

ডাক্তার হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—কোনো অসুবিধা হবে না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীকে চক্ষে দেখবার কোন প্রয়োজন নেই। লক্ষণ শুনেই চিকিৎসা চলে। হুঁ! তা ছাড়া এই যে একটি ফোঁটা ওষুধ খাওয়ালুম···এখন তিন মাস আর ওষুধের বিন্দুমাত্র না—তাহলে ফল হবে না। তিন মাস পরে লক্ষণ লিখে আমায় পাঠাবেন, আমি ডাকে ওষুধ পাঠাবো।···

ভাগিনেয় স্তম্ভিত! ধন্বন্তরি বলিয়া একটা নাম শুনা ছিল। বোধ হয়, চিকিৎসা-বিদ্যায় তিনি এমনি ওস্তাদই ছিলেন!···

সপরিবারে তারিণীচরণ কাশী যাত্রা করিলেন। ডাক্তারী চিকিৎসা ছাড়িয়া সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীর শরণ লওয়া হইল। হোম-যাগ-যজ্ঞের সমারোহ সুরু হইল, এবং তিন মাস হোম-যাগ যজ্ঞের পরও দেখা গেল, তারিণীচরণের রোগ সারিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, শরীর ক্রমেই আরো ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।...শেষে এমন হইল যে কাশী হইতে নড়িবারও উপায় রহিল না।

তারিণীচরণ যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, অনিশ সপ্তাহে একবার কি দুইবার করিয়া তাঁকে দেখিতে যাইত। রোগীর ঘরে ঘণ্টা দুই চুপ্‌চাপ বসিয়া থাকিত, তার পর জলখাবার আসিত, কোনো দিন তার একটু মুখে তুলিত, কোনো দিন 'না, না' বলিয়া ফেলিয়া রাখিত এবং এমনি ভাবে জামাতার কর্ত্তব্য সারিয়া বুকে আগুন জ্বালিয়া সে গৃহে

ফিরিত। শোভার সহিত নিরালা ঘরে দেখা করাইবার প্রয়াস কাহারো ছিল না। শোভা তার সামনে মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া বাপের কাছে বসিয়া থাকিত, বাপের সেবা করিত,—ঘোমটার অন্তরাল দিয়া একটা অপাঙ্গ দৃষ্টিও অনিশের প্রতি নিক্ষেপের তার এতটুকু চেষ্টা ছিল না। ঐ এক-ঝলক্‌ দৃষ্টির জন্য ব্যাকুল আশা বুকে বহিয়া অনিশ বাগবাজারে ছুটিত, কিন্তু তার এই অতি-ক্ষুদ্র আশাটুকুও কোনো দিন মিটে নাই! অনিশ ভাবিত, এই কিশোরী বধূর চিত্তে যৌবন কি কোনো দিন জাগিয়া সাড়া দিবে না?...এ কি ব্রহ্মচারিণী, তপস্বিনীকে সে বধূত্বে বরণ করিয়া বসিয়াছে!...

কাশী হইতে শোভার চিঠি মাঝে মাঝে আসিত,—সে সব চিঠি মার নামে। শাশুড়ীর সঙ্গেই ভক্তিমতী বধূর যা-কিছু সম্পর্ক! দেখিয়া শুনিয়া অনিশ একদিন বিদ্রোহের নিশান তুলিয়া ধরিল, ফুঁশিয়া মনে মনে সে গর্জ্জন তুলিল, এমন উপেক্ষা! তুচ্ছ নারী হইয়া এত তেজ! বেশ, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় যদি, তো যাক তা—এ হৃদয় হইতে তোমারো নির্ব্বাসন—চির-নির্ব্বাসন!...

বধূকে নির্ব্বাসন দিয়া ওদিককার বোঝাপড়া চুকাইয়া, যাদের অন্যায় উৎপীড়নে তার হৃদয় এই বয়সে খালি হইয়া গেছে, তাদের সঙ্গে সে বোঝাপড়ায় নামিল।

সকালে উঠিয়া মাকে সে বলিল,—আজ থেকে দোকানে যাবো না আর। আমার এম-এ পড়ার খরচ তোমরা দিতে পারবে কি না, বলো। আর না...?

মা বলিলেন,—আমি কি তার মালিক যে আমায় ও কথা বলচো! ওঁকে বলো গে যাও

অনিশ কহিল,—বাবা কোনো কথা শুনবে না কি? কিছু বললেই

অমনি তেড়ে মারতে উঠবে! যদি দোকানেই বসাবে তো আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলে কেন তোমরা? লেখা-পড়া শিখে আমি ও উঞ্ছবৃত্তি করতে পারবো না…

মা কহিলেন—ও কথা বলিস্ নে। পায়ের উপর পা দিয়ে নির্বিবাদে আরামে এই যে বাস করচো, এ ওই কারবারের কল্যাণে! কারবার লক্ষ্মী। কথাটা বলিয়া মা ভক্তিভরে কপালে হাত ছোঁয়াইলেন।

ছেলে বলিল,—তুমি বাবাকে বলো…আমি আজ থেকে দোকানে বেরুবো না। পড়ার খরচ তোমরা যদি না দাও তো আমায় যেমন করে হোক, তার জোগাড় দেখতে হবে। ঘড়ি আংটী বেচেও…

মা কহিলেন—ঘড়ি-আংটী বেচে তো লক্ষ টাকা মিলবে! অমন দুর্ব্বুদ্ধি করিস্ নে, রে…জানিস্ তো ওঁর গোঁ!

অনিশ বলিল—জানি। ঐ গোঁর পায়ে তা বলে এমন করে আত্মবলি দিতে পারবো না আমি। এতখানি অধীনতা, দাস্য? আমার বয়স হয়েচে, জ্ঞান হয়েচে, নিজের বোঝবার সামর্থ্যও হয়েচে!…তোমরা না পড়াও, আমি দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করবো…

মার দুই চোখ কপালে উঠিল। বিস্ফারিত চক্ষে ছেলের পানে চাহিয়া মা কহিলেন,—কি করবি, শুনি?

অনিশ কহিল—আজই কংগ্রেসের কাজে যোগ দেবো, নয় তো দৈনিক-সাপ্তাহিক কোনো কাগজে দেশের কথা লিখে দেশের কাজ করবো।…

মা কহিলেন—যা ভালো বোঝো, করো…আমায় এর মধ্যে জড়িয়ো না, বাপু। তোমাদের বাপে-বেটায় যুদ্ধ হবে, আর আমি যে মাঝে থেকে ·

বাহির হইতে দাসী ডাকিল,—মা, রান্নাঘরে একবার আসতে হবে

—যাই রে···বলিয়া মা তাঁর কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই রান্নাঘরে ছুটিলেন।··

অনিশ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল, আক্রোশে ফুলিয়া আত্মগত-ভাবে কহিল, আমার জীবনের পুষ্পিত কুঞ্জটিকে আগুনে পুড়িয়ে এখন সমস্ত জীবনটাকে আমার ছাই করতে চাও! আমি তা সহ্য করবো না। আমিও দেখাতে চাই, আমার মন আছে! সজীব মন!···না হয় প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটবে! ঘটুক! এ দরিদ্র দেশের দারিদ্র্যই আমি মাথায় তুলে নেবো। তাতে মনকে এ-ভাবে ছেঁচে হত্যা করতে হবে না···!

কিন্তু কোথায় যায়? কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই দেশের ব্রত গ্রহণ করে?···

তখন নন্-কো-অপারেশন স্থরু হইয়াছে···খদ্দর-যজ্ঞের স্থচনা মাত্র। দলে দলে ছেলেরা মাতিয়া সে যজ্ঞে আহুতি হইতে ছুটিয়াছে। পুলিশ, জেল—এ সবের কোনো তোয়াক্কা কেহ রাখে না! ঐ ডাকই আসল! তার পাশে আইন-আদালত পুলিশ-বিভীষিকা এ-সব যেন স্বপ্নের আবছায়া!···অনিশ ভাবিল, তাদের দলের মহেন্দ্র তো ঐ দলে ঢুকিয়াছে। সে মহেন্দ্রকে ধরিবে। মহেন্দ্রকে ধরিয়াই দেশ-মাতার পায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইবে!···ভারত-মাতার সেবা-ব্রতে দীক্ষা লইবে।

কল্পনা-নেত্রে সে যেন স্পষ্ট দেখিল, ভারতবর্ষের ম্যাপখানা সজীব হইয়া মুকুট-ধারিণী ভারত-লক্ষ্মীর বেশে হিমালয়ের পাদমূলে দাঁড়াইয়া, আর তাঁর পায়ের নীচে প্রকাণ্ড শ্যামল উপত্যকায় আগাগোড়া খদ্দর বিছানো···এবং সেই খদ্দরের উপর বাঙালী বেহারী পাঞ্জাবী মারহাট্টি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বিলাতী কাপড়ের মশাল জ্বালিয়া ভারত-লক্ষ্মীর আরতি করিতেছে!···সেও ঐ প্রচণ্ড ভিড়ের এক ধারে দাঁড়াইয়া, হাতে

সুইডেনের তৈয়ারী দিয়াশলাইয়ের বাক্স···মশাল বানাইবার জন্য এক-টুকরা বিলাতী কাপড়ের সন্ধানে সে ব্যাকুল!··

অনিশ তখনি মহেন্দ্রর উদ্দেশে ছুটিল। মহেন্দ্রর বাড়ী গড়পারে। সেখানে গিয়া শুনিল, মহেন্দ্র বরিশালে প্রচার-কার্য্যে গিয়া বিলাতী কাপড় পুড়াইবার গোলে পুলিশের হাতে পড়িয়া জেলে গিয়াছে। সে শিহরিয়া উঠিল। জেল!···চোখের সাম্‌নে কারাগারের মস্ত প্রাচীর মাথা তুলিয়া যেন অট্টহাস্য করিল! অনিশ ভাবিল, মন্দ নয়। জেলেই সে যাইবে! কঠিন রুদ্র যা-কিছু, আজ হইতে তাই তার কাম্য! প্রেমের কোমল মধুর রাগিণী, প্রণয়ের আবেশ—এগুলা যখন মরীচিকায় দাঁড়াইল, তখন ও কুহক-স্বপ্নের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে এই মহামন্ত্রে দীক্ষা লওয়া ছাড়া অন্য কি উপায়ই বা আছে!—এম-এ, ল ··? সে পথও তো···

পথের একটা হদিশ্‌ ঠাওরাইতে না পারিয়া সে ফিরিয়া সার্কুলার রোডের ট্রামে চাপিয়া সোজা ভবানীপুরে আসিল, এবং একেবারে গিয়া উঠিল, শরতের বাড়ী। শরৎ বাড়ীতেই ছিল, তাকে দেখিয়া কহিল,—ব্যাপার কি হে? এত বেলায়, উস্কখুস্ক মূর্ত্তি···

অনিশ কহিল,—বড্ড ঘুরেচি। আমার স্নানাহার এখানেই হবে। ব্যবস্থা করে দাও, ভাই।

শরৎ সবিস্ময়ে কহিল,—হঠাৎ? বাড়ীতে দাম্পত্য-কলহ?

ম্লান হাসি হাসিয়া অনিশ কহিল,—দাম্পত্য-কলহের অপর পক্ষ আজ চার-পাঁচ মাস কাশীবাস করচেন।

শরৎ কহিল,—কৈ, শুনিনি তো সে খপর!···

অনিশ কহিল,—প্রয়োজন হয়নি বলবার!···

শরৎ কহিল,—মানের দায়ে তুই মানিনী
তাই সেজেচিস্‌ বিদেশিনী··?

অনিশ কহিল,—না।

শরৎ কহিল,—না কি! বেশ কিছু ঘটেচে···তোর যে রকম শুষ্ক ম্লান মূর্ত্তি দেখচি···

অনিশ কহিল,—সব বলবো।···তুই ভাই, আমার নাবার-খাবার জোগাড় করে দে···

শরৎ কহিল,—বাড়ীতে···?

অনিশ কহিল,—বাড়ীতে আমি বলে-কয়েই এসেচি।···

শরৎ কহিল—বোস্···আমি জোগাড় করিয়ে দি। আমি খেতে যাচ্ছিলুম! তাহলে, একসঙ্গেই দু'জনে খাবো।···

শরৎ চলিয়া গেল। অনিশ টেবিলের উপর হইতে একখানা খবরের কাগজ টানিয়া লইল।···টেলিগ্রাম, স্পোর্টস্, সংবাদ প্রভৃতি কলমগুলার উপর চোখ পড়ে, কিন্তু মন কোনটাতে ভিড়িতে চায় না! সে তখন বিজ্ঞাপন-কলম খুলিয়া বসিল। সেই সব মামুলি বিজ্ঞাপন··· টিনের হাতা, দোয়াত-দান, এক প্যাকেট নিব···এক মেমসাহেবের সম্পত্তি শস্তা দরে বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে! বাড়ীভাড়া, মোটর বিক্রয়,—এত ব্যাপার···যে, রাজ্যের লোকের অভাব মিটিতে পারে!··· চাকরি-খালির কলমেও নজর পড়িল। চারিদিকে সকলে মেকানিক, মোটর-ড্রাইভার, নার্স, নয়তো বিলাত যাইবার সঙ্গী চায়!···শেষে একটা ···বাঃ, অনিশ তখন আগ্রহে একটা বিজ্ঞাপনে ঝুঁকিয়া পড়িল।···

—ভাগলপুরের এক প্রাইভেট স্কুলে সেকণ্ড মাষ্টারের প্রয়োজন। বি-এ পাশ, তরুণ-বয়স, উদার-চিত্ত মাষ্টার চাই। বেতন মাসে পঞ্চাশ টাকা। তিন বছর টিঁকিয়া থাকিতে হইবে,—পাকা লেখাপড়া করিয়া।···সেক্রেটারির কাছে আবেদন করুন।

মন বলিল, চমৎকার! এই বেশ! জেলের আতঙ্ক নাই, কোর্টে

বিপদ নাই! নির্ঝঞ্ঝাট! তাছাড়া ভাগলপুর জায়গা ভালো—সেখানে ল' পড়াও চলিতে পারিবে!···আজ এখনই বুরাত ঠুকিয়া একটা দরখাস্ত ···কোনো দ্বিধা নয়, দ্বিতীয় চিন্তামাত্র নয়!···

শরতের ভৃত্য কাপড়, টোয়ালে ও তেল লইয়া আসিল। অনিশ চট্‌পট্ স্নানাহার শেষ করিল। শরৎ কহিল,—এবার বল্ তো ব্যাপার···

অনিশ কহিল,—একটু সবুর কর্! একখানা চিঠির কাগজ আর খাম দে, ভাই···

শরৎ কহিল,—বেশ!···

চিঠির কাগজ আসিল। অনিশ দরখাস্ত লিখিল। শরৎ কহিল, —এর মানে?

অনিশ কহিল,—জীবনে একটু বৈচিত্র্য। নাহলে পাগল হয়ে যাবো কোন্ দিন!···

শরৎ বাধা দিল না। কহিল—বলবি না?

অনিশ কহিল,—বলি···

অনিশ সংক্ষেপে আপনার হৃদয়-বেদনার হৃদয়ভেদী কাহিনী বন্ধুর কাছে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শরৎ চুপ করিয়া রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল—হুঁ!···

অনিশ কহিল,—দেশের কবি আর ঔপন্যাসিকদের কাছে পেলে বলি, জীবনের ছবিতে অত গোলাপী রঙ লাগাও কেন? পড়ে আমরা সংসারে দিশাহারা হয়ে যাই! জীবনটা কাব্য-লোকের ধার দিয়েও যেতে জানে না! এই যে সমস্যা আমার জীবনে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেচে, আমি ঐ রবিবাবুকে পেলেই বলি, চারিদিকে সামঞ্জস্য রেখে এর সমাধান করে দিন্ তো, দেখি···অর্থাৎ বধূ আমার প্রতি অনুরাগী হবেন, পিতা-মাতা কোনো দিক দিয়ে অনুযোগ তুলবেন না—সুশৃঙ্খল ধারায় জীবন বয়ে

চলবে, পুষ্পিত, পল্লবিত হয়ে!…বইয়ের পাতায় বেশ সহজ সুখের ছবি আঁকেন, তার এক টুকরো বাস্তব-জীবনে ফুটিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করুন, দেখি!…

কথাটা একটানে বলিয়া ফেলিয়া অনিশ মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল; তার পর তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিল। শরৎ বিমূঢ় স্তম্ভিত বসিয়া রহিল,—বাক্যহারা, চিন্তালেশহীন জড় পুতুলের মত!…

বৈকালের দিকে অনিশ কহিল,—একবার বাড়ী ঘুরে আসি। টাকা-কড়ি যা আছে…তাছাড়া কাপড়-চোপড়ও…এনে এইখানে রাখবো। তার পর ঐ জবাব আসার ওয়াস্তা! এক হপ্তা দেখি। এ এক হপ্তা হোটেল খাওয়া…এখানে দু'বেলা খেতে এলে তোর বাড়ীতে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাছাড়া আমার ওখান থেকে যদি খোঁজ-খপর নিতে আসে…! এ এক হপ্তা অজ্ঞাতবাস…তোর সঙ্গে একবার করে দেখা হবে। চিঠির জবাবে যদি চাকরীটা লেগে যায়, বাস্…! এই অস্ত্রে দেখি, জয়-লাভ করতে পারি কি না!…

শরৎ কহিল—কিন্তু বৌ তো কাশীতে…?

অনিশ কহিল,—তা হোক। একদিন তাকে ফিরতে তো হবেই! গৃহে ফিরবে, আমার হৃদয়ে নয়। আমি তাকে চির-নির্ব্বাসিত করলুম আমার এ হৃদয় থেকে!…

শরৎ কহিল,—এমন কি লজ্জা তার…সেই কথাই ভাবচি।

অনিশ কহিল,—ভাব্ তুই! আমি ও কথা ঢের ভেবেচি। ভাবনার শেষ সীমায় পৌঁছে এই কার্য্যানুষ্ঠান হলো আজ!…আমি তাহলে চললুম।

শরৎ কহিল,—রাত্রে ফিরবি তো?

অনিশ কহিল,—আজ রাত্রে তোর এখানেই বাস। তার পর কাল থেকে লুকোচুরি সুরু।...

বন্ধুর কাছ হইতে বিদায় লইয়া অনিশ গৃহে ফিরিল। মার সঙ্গে দেখা হইল। মার মুখ ম্লান। মা কহিলেন—কোথায় ছিলি সারা দিন?

অনিশ কহিল—কলেজ-টলেজগুলো ঘুরে এলুম।

মা অনিশের পানে চাহিলেন,—খেলি কোথায়?

অনিশ কহিল—খাবার ভাবনা কি! হোটেল!

মা কহিলেন,—হুঁ।...

অনিশ চুপচাপ উপরে উঠিতেছিল, মা ডাকিলেন,—অনি...

—কি?...

—শুনে যা...

অনিশ আসিল। মা গাঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—তোর শ্বশুর কাল মারা গেছেন। টেলিগ্রাম এসেচে। উনি আজ রাত্রেই কাশী যাচ্ছেন। তুই ও...

—আমি যেতে পারবো না। আমার এখানে ঢের কাজ...

অনিশ উপরে নিজের ঘরে গেল। পয়সা-কড়ি যা সঞ্চয় ছিল, সংগ্রহ করিয়া কাপড়চোপড় লইয়া একটা ছোট সুট্‌কেশে পূরিল। এবং সুট্‌কেশটা হাতে ঝুলাইয়া আধ ঘণ্টা পরে নীচে নামিল। মা কহিলেন, —চললি কোথায়?

অনিশ কহিল,—কলেজের বোর্ডিংয়ে।...

মা বিস্ময়ে অবাক! অনিশ কহিল,—আমি এখন কিছুদিন ফিরবো না। আমায় খুঁজো না...

মার উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া অনিশ দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে পথে

আসিয়া দাঁড়াইল। তারিণীবাবুর মৃত্যুতে মার বুকে আঘাত লাগিয়া ছিল। এ সময় ছেলের এই অপ্রত্যাশিত আচরণ! বিস্ময়ে মা কেমন গুম্ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁর চোখের সামনে রাশি রাশি অন্ধকার জমিয়া দুনিয়াটাকে নিমেষে দৃষ্টির অন্তরালে ঢাকিয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

কান্তি চৌধুরী

তার পর পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

প্রাইভেট স্কুলের সেকণ্ড-মাষ্টার অনিশ এখন ভাগলপুরে ওকালতি সুরু করিয়াছে। পাঁচটা বছর জীবনে যেন তার পাঁচ যুগ! রুদ্র সাধনায় কি করিয়া সে এই ক'টা বছর কাটাইয়াছে, লিখিবার বস্তু। অনিশের বাসনা আছে, কখনো যদি সুদিন পায় তো তার পল্লবিত কাহিনী লিখিয়া মাসিকপত্রে ছাপাইবে!

পঞ্চাশ টাকায় মানুষের দিন চলে না—বিশেষ অনিশের মত লোকের। ভাগলপুরের বড় উকিল টহলপ্রসাদের দু'টি ছেলেকে দু'বেলায় তাদের গৃহে পড়াইয়া সে মাসে আরো পঞ্চাশ টাকার জোগাড় করে। একা মানুষ,...মফঃস্বলে একশো টাকায় তোফা চালানো যায়।...তার পর ছিল তার কাব্যচর্চ্চা...কবিতা লিখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া এবং অবশেষে গল্প লিখিয়া ভাগলপুরের তরুণ-মহলে আপনাকে অচিরে সে পরিচিত করিয়া তুলিল; সঙ্গে সঙ্গে ল' পড়া। বিবিধভাবে মনকে খাটাইয়া সে শোভার দুঃখ ভুলিয়াছিল। মন তবু থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া কহিত, কৈ, শোভা তো মাথা নীচু করিয়া আসিয়া ধরা দিল না!...

উকিল হইয়া সে টহলপ্রসাদের জুনিয়ারী ধরিল। তার দুই ছেলেকে পড়ানোর কাজ ছাড়ে নাই—টহলপ্রসাদকে ঐ দিক দিয়াই স্নেহে বাঁধিয়াছে। কাজেই সাধারণ জুনিয়ারদের চেয়ে তার ঠাঁই একটু উঁচুতে। দু-চারবার গৃহেও সে গিয়াছিল,—মা কাঁদিয়াছেন, বাপ তর্জ্জন

তুলিয়াছেন, নির্বিকার চিত্তে সে সে-অশ্রু, সে-রোষের ব্যূহ ভেদ করিয়া আবার ভাগলপুরে ফিরিয়াছে। বধূ শোভা সেই যে ভবানীপুরের বাড়ী ছাড়িয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর ফেরে নাই। তারিণীবাবুর মৃত্যু, তার পর শোভার মার বেশী অসুখ, তার পর নিজের টাইফয়েড—একটা না-একটা সেখানে লাগিয়াই আছে! কাজেই পরেশ মিত্র স্নেহ-ভরে বলিয়া দিয়াছেন,—আমার ঘরের বউ বটে, কিন্তু তাদের মেয়ে তো! বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া মেয়েকে বিসর্জ্জন দেন নাই! অসময়ে যদি না দেখিবে, তো মেয়ের প্রয়োজন কি!—গৃহিণী চোখের জল ফেলিলেন, কিন্তু অনিশের গোঁ-ভরে গৃহত্যাগের পর কর্ত্তার গোঁ এমন প্রবল হইয়া কর্ত্তৃত্ব ধরিয়াছে যে, চোখের জলে তা হঠিবার নয়! অনিশের বাপ ভয়ও দেখাইয়াছেন, কারবার না দেখিতে পারো তো এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইব…

যত সাহসের আস্ফালন করুক, অনিশ এ ভয়ঙ্কর চিঠির কোনো জবাব দেয় নাই! কাজেই ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত ঘটে নাই!…

উকিল হইয়া অনিশ ভাগলপুরে নাথনগর রোডে রেল-লাইনের ধারে একটা বাংলা ভাড়া লইল। বাংলার একটা ঘরে মুহুরি হরসুখদাসের আস্তানা ছিল; তাছাড়া একটা ভৃত্য আর এক পাচক—ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া তার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল।

পূজার ছুটীর পর তার পাশের বাংলায় একদিন লোকের কোলাহল জাগিয়াছে শুনা গেল। মুহুরি কহিল, পাশের বাংলায় ভাড়াটিয়া আসিয়াছে; এক বাঙালীবাবু সপরিবারে।

বাঙালী বাবুটির সঙ্গে অচিরে দেখা হইল। একটা ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তিনি আসিয়া দ্বারে হানা দিলেন। অনিশ তখন একটা আর্জির মুশাবিদা করিতেছিল। মুখ তুলিয়া সে কহিল,—কাকে চান্?

হাসিয়া আগন্তুক কহিলেন,—আপাততঃ আপনাকে।

পাশের চেয়ারের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া অনিশ কহিল,—বসুন।

আগন্তুক কহিলেন,—বসার আগে একটু নিবেদন আছে।

অনিশ কহিল,—বলুন।

আগন্তুক কহিলেন—আপনার পাশের বাংলায় আজই সকালে এসে আমরা উঠেচি—অর্থাৎ আমি সপরিবারে। আমার এক আত্মীয়ার অসুখ, তাই ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদলাতে এসেচি।···

অনিশ কহিল—আমায় কি করতে হবে, বলুন।

আগন্তুক কহিলেন—আপনার বাড়ীর কূয়ো থেকে আমার এই লোক খাবার জল নিয়ে যাবে—এই অনুমতিটুকু···

অনিশ কহিল—বেশ···এতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

আগন্তুক কহিলেন—আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কোনো অসুবিধা না হয়···

হাসিয়া অনিশ কহিল,—সে আশঙ্কা নেই। কারণ, আমি একা আছি···মেয়েরা এখানে নেই।

—বটে!···বলিয়া আগন্তুক ভৃত্যের পানে চাহিয়া কহিলেন—তাহলে জল নেবার সোরাই আন্। তার পর অনিশের দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন,—আপনার লোকজনকে দয়া করে তাহলে যদি···

অনিশ ভৃত্যকে ডাকিলেন,—জোগুয়া···

ভৃত্য আসিলে সে বলিয়া দিল,—এঁর লোক ভিতরের কূয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে, কূয়ো দেখিয়ে দিয়ো।

ভৃত্য কহিল,—বহুৎ আচ্ছা।

আগন্তুক চেয়ারে বসিলেন, কহিলেন—মশায়ের নাম?

—শ্রীঅনিশচন্দ্র মিত্র।

—ব্যবসা ওকালতি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—আসর দেখেই বুঝেচি!···পাশে যখন বাস করতে এলুম, তখন জ্বালাতন করবো মাঝে মাঝে। আশা করি, বিরক্ত হবেন না। বিদেশে বাঙালী এসে বাঙালীর কাছেই তার অভাব-অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াবে না তো কোথায় যাবে, বলুন?

অনিশ কহিল—মশায়ের নাম···?

আগন্তুক কহিলেন—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন। আমার নাম শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী, সামান্য কিছু কারবার আছে···নিবাস বঙ্গে।

অনিশ কহিল—চা আনতে বলবো?

হাসিয়া আগন্তুক কহিলেন—বলুন। চায়ে অরুচি বাঙালীর আর কবে, বলুন? চা হলো এখন আলাপের প্রধান অবলম্বন।

অনিশ ডাকিল,—ঠাকুর···

প্রকাণ্ড-টিকি খোট্টা পাচক আসিয়া দেখা দিল। অনিশ বলিল—দো' পেয়ালা চা বানাও···

—যো হুকুম। বলিয়া পাচক বিদায় লইল।

কান্তিবাবু কহিলেন—খোট্টা বামুনে চা তৈরী করতে পারে?

অনিশ কহিল—না পারলে আর কি করচি, বলুন?

কান্তিবাবু কহিলেন—মেয়েরা কবে ফিরবেন?

অনিশ কহিল—দেখি। সেখানে অসুখ-বিসুখ···

—বাড়ীতে?

—হাঁ।

—ও! তাই দেখতে গেছেন? কলকাতায় আপনার বাড়ী?

—হাঁ!

—কলকাতার বার ছেড়ে ভাগলপুরে জয়েন করলেন যে?···

—একটু আরামে বাস করবো বলে···

—তা ঠিক। প্রথমতঃ কলকাতায় উকিলের ছড়াছড়ি···যত মক্কেল, তার ডবল উকিল! দেখলে আতঙ্ক হয়!···ভাগ্যে, ও-পথের পথিক হতে হয়নি। ল' পড়া ধরে ছেড়ে দিলুম···পাশ হলেই ফাঁসে জড়িয়ে মরতে হতো!···

কথাটা অনিশের ভালো লাগিল না। কোন্ জুনিয়ারের এ কথা ভালো লাগে! পাশ করিয়া কাছারির মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইতে পারিলে মাথার উপর সারা আকাশ রঙীন দেখায়। ঐ সব মক্কেলের দল··· উন্মুক্ত তৃণাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মেষপাল দেখিলে রাখালের প্রাণ যেমন আনন্দে ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে, নূতন উকিলের মনটাও তেমনি কাছারির হাতায় মক্কেল দেখিলে ফুলিয়া ওঠে! অপর রাখালের মেষ? তা হোক্! দলে দলে আসিতেছে তো! একটা দল হাতে গাঁথিবে যখন···? আশার প্রথম মোহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি ব্যাঘ্র-মূর্ত্তির ছবি মনে কোনো-দিন উদয় হয় না। কলেজ-ছাড়া জীব, মুক্তির পথে সদ্য পা দিয়াছে, মনে হয়, এর কোথাও বাঁধন নাই, আগল নাই! দিকে দিকে চলিবার ফিরিবার পথ এমনি মুক্ত, অবাধ!

কান্তিবাবুর ভৃত্য দু'টা কুঁজা লইয়া আসিল। কান্তিবাবু কহিলেন, —মেয়েরা নেই তো· যদি অনুমতি হয়, তাহলে ওকে নিয়ে একবার কূয়োর কাছে যাই। অর্থাৎ, আমার বাংলার কূয়োর জল বহুদিন অব্যবহারে ময়লা হয়ে আছে, সেটার সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ও-জল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হয়তো অনুকূল হবে না···সেই সঙ্গে আপনার বাংলাখানিও দেখা হয়ে যাবে!···বাড়ীটা খাশা···অজস্র ফুল ফুটিয়েচেন।

অ··· গর্ব্ব বোধ করিল, কহিল—একদম্ পড়েছিল বাংলাখানা। এক মেম-সাহেবের সম্পত্তি। সে থাকে সাহেবগঞ্জে, তার স্বামী রেলের

গার্ড ছিল—মারা গেছে। সাহেবগঞ্জে আত্মীয়-স্বজন আছে—এটা ভাড়া দেছে। আমিই এ'বাংলায় প্রথম ভাড়াটিয়া।...

কান্তিবাবুকে লইয়া অনিশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সামনেই বড় হল-ঘর—তার দু'পাশে শোবার ঘর। শয়ন-ঘরের পাশে বাথরুম। তার পর পিছনে রান্না ঘর—ভিন্ন হাতায়। মাঝখানে একটা উঠান; উঠানের একধারে সিমেণ্টে বাঁধানো কূয়া। ভৃত্য কূয়ায় জল তুলিতে গেল। অনিশ কান্তিবাবুকে ঘর দেখাইতে আনিল। শোবার ঘরের মাঝামাঝি একখানি স্প্রীংয়ের খাট পাতা...এক ধারে একটা আর্শির টেবিল—তার উপর চিরুণী, ব্রশ, শেভিংশেট প্রভৃতি; অপর ধারে একটা আলমারি। ও-পাশের শোবার ঘরে মাঝারি বুক-সেল্‌ফ্‌—লিখিবার টেবিল, চেয়ার, টেবিলের উপর একরাশ খাতা, প্যাড প্রভৃতি। এক ধারে টেবিলের উপর গ্রামোফোন; এবং একটি টেবিল হার্ম্মোনিয়মও আছে। কান্তিবাবু কহিলেন—আপনি নিজেই গান? না, আপনার স্ত্রী?

অনিশ কহিল—না, আমিই কখনো কখনো গাই।

—বাঃ! তবে তো ভালোই হলো! দুঃখ এই, আপনার গৃহিণী এখানে নেই...থাকলে আমার বাড়ীর মেয়েরা সঙ্গী পেতেন। পাশের বাংলায় বাঙালী থাকেন শুনে তাঁরা ভারী খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন, যেমন সহর ছেড়ে একটেরে বাংলা নেওয়া হয়েচে, ভেবেছিলুন, সঙ্গী পাবো না, তেমনি...! তা, আমরা তিন মাস তো আছি—এর মধ্যে আপনার স্ত্রী ফিরবেন, নিশ্চয়!

অনিশ চুপ করিয়া রহিল, যেন কাঠের মূর্ত্তি! হারানো একটা ক্ষীণ স্মৃতি বুকের নিভৃত কোণে অস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কোনো মতে সে কহিল—দেখা যাক...

কান্তিবাবু কহিলেন—বাঃ, আপনার শেল্‌ফ্‌টিও খাসা—ভালো ভালো বইই আছে! দেখতে পারি?...

—স্বচ্ছন্দে!

শেল্‌ফের সামনে দাঁড়াইয়া কান্তিবাবু শেল্‌ফে ঠাশা বইগুলার নাম দেখিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন—চমৎকার! সাহিত্যে জাতিভেদ মানেন না আপনি মোটেই, দেখচি! সেক্‌শ্‌পীয়র, বার্ণার্ড শ, তাঁদের পাশে রবীন্দ্রনাথ! তা ছাড়া আনাতোল ফ্রাঁশ, রোলাঁর পাশে এই যে দেখচি, আমাদের বাঙালী দু-চারজন হালের ঔপন্যাসিককেও রেখেচেন। ইংরাজী বই এক তাকে, বাঙলা অপর তাকে—তা তো রাখেন নি!...

অনিশ কহিল—এঁরা বাঙালী বলেই আমরা এঁদের ছোট করে দেখি। নাহলে ঐ বিদেশী ওস্তাদদের চেয়ে বড় বেশী নীচে এঁদের ঠাঁই নয়! মনের কালচার, এঁদের বাণী, প্রকাশের ভঙ্গী—এগুলোর হিসেব যদি জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করি...

কান্তিবাবু কহিলেন—যা বলেচেন! ইংরাজ চাকরি দেবার বেলায় কালা-গোরা রঙে পার্থক্য করে বলে আমরা অন্দরের দালানে এসে হুঙ্কার তুলি; কিন্তু সব পলিটিক্সের বাইরে যে-সাহিত্য—তার বিচার করতে বসেও কালোকে গোরার কত নীচে আমরা ঠাঁই দি!...বঙ্কিমকে বলি বাঙলার স্কট্...স্কট্ কেন? না, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন বলেই বঙ্কিমের গৌরব! কিন্তু বঙ্কিমের মত দিব্যদৃষ্টি, সাহিত্য গড়ে তোলবার এমন প্রচুর শক্তি...স্কটের মধ্যে কি যথার্থই পাই..? আপনাদের কি মত, জানি না; তবে কালা-গোরার ভেদের ঊর্দ্ধে মনকে যদি কোনো ক্ষণে তুলতে পারি তো আমার মনে সে-ক্ষণে সংশয় জাগে, মশায়! এতে আমায় idiot বলেন যদি তো নাচার! আমি অকপটেই মনের এ কথা প্রকাশ করচি।...

কথাটা শুনিয়া অনিশের মনে বিস্ময়-বোধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকের উপর সম্ভ্রমের উদয় হইল। কারবারী লোক, হাওয়া খাইতে ভাগলপুরে আসিয়াছে—এমন প্রায় আসে, কত আসে—এমনি ভাবিয়াই প্রবাসীকে দু-ফোঁটা করুণা বিলাইবার কথাই তার মনে জাগিয়াছিল। এ কথায় আরাম পাইয়া সে ভাবিল, ভালো লোককেই পাশে পাওয়া গিয়াছে! অবসর মত সাহিত্যের দু'চারিটা আলোচনাও চলিবে ইঁহার সঙ্গে! চাই কি, সে আলোচনায় যে সত্য লাভ হইবে, এক সময় তাকেই পল্লবিত করিয়া কলমের সাহায্যে কাগজে ছাপিয়া মাসিকের মারফৎ ধাঁ করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে চমকাইয়া দিতেও পারিবে!…কিন্তু তার আগে… ঠিক!

অনিশ কহিল—ঠিক বলেচেন! আপনি সাহিত্যের বেশ ওস্তাদ সমজদার, দেখচি! লেখাটেখা আসে?

তাচ্ছল্যের ভরে কান্তিবাবু কহিলেন—রামচন্দ্র! বলে, কারবারের পাল্লায় নজর রাখতে রাখতে জীবন কাটলো! আবার লেখা? তা… মিথ্যাই-বা বলি কেন! লিখি বৈ কি—খেরোয় বাঁধা মোটা খাতায় রোজকার হিসেব লিখি, কৈফিয়ৎ কাটি, এবং মাঝে মাঝে চালানও লিখি!…

অনিশ কহিল—হুঁ! সে ভাবিল, ভালোই! এ সব তথ্য ইনি লিখিয়া ছাপাইতে চান্ না,—তাহা হইলে সে একদিন এ-সব কথার সদ্ব্যবহার করিবে।

কান্তিবাবু শেল্ফ্ হইতে একখানা বই টানিয়া বাহির করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র। বইখানা হাতে রাখিয়া কহিলেন—The Universal Hero. মানবতার এমন চরম আদর্শ দুনিয়ার কোনো মহা-গ্রন্থে ফোটেনি! রাখাল-ছেলেদের খেলার সঙ্গী হলেন—প্রভাসে

তাদের দেখে সিংহাসন ছেড়ে ছুটে এলেন! What an idea! সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে ছেঁটে ভেঙ্গে কি উদারতার হাওয়াই দুনিয়ায় বইয়ে দেছেন! এক এক সময় আমার কি মনে হয়, জানেন? ধর্ম্মের ছোটখাট সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মায়া ত্যাগ করে বিশ্বের মানুষ নিরপেক্ষ মনে যদি সব ধর্ম্মের আলোচনা করে, তাহলে তারা এই শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলে মেনে তাঁর পায়ে মাথা নোয়াবে! Krishnaism একদিন সারা দুনিয়ার ধর্ম্ম হবে!

অনিশ চমকিয়া উঠিল। ভদ্রলোক দু-একটা ইঙ্গিতে মস্ত বড় কথা বলিয়াছেন! পড়াশুনাও···কারবারী বলিয়া সে তাচ্ছল্যের চোখে দেখিতেছিল···এক মিনিটের আলাপে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে দু-চারিটা মন্তব্য যা করিতেছেন, তা কাণে সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিতেছে! মাসিকপত্রে গবেষণায়-ভরা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা বেদান্ত-উপনিষদের গর্ব্বস্ফীত আলোচনা সে তার নিঃসঙ্গ জীবনে অনেক ঘাঁটিয়াছে, কিন্তু সে-সব কি ফাঁকির ফাঁকেই ভরা!

অনিশ কহিল—পড়বেন কৃষ্ণচরিত্র? নিয়ে যান্।

কান্তিবাবু কহিলেন,—আপাততঃ থাক। পড়বো বৈ কি! আজ তো ঘরকন্নার কাজেই সময় কাটবে, কোথায় খাবো, কি খাবো, কোথায় শোবো···এই সবের চিন্তা—এ যে কত বড়···এ চিন্তা সন্ন্যাসীর ভগবচ্চিন্তাকেও নিমেষে রসাতলে দিতে পারে! থাক্···দেখে রাখলুম,—এক-সময় আপনার এই শেল্‌ফটিকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করবার বাসনা রইলো···

অনিশ কহিল—আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ যদি···

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন—থাক্, সে কাজটা নিষ্পন্ন হবে—কারণ আমার গৃহিণী গৃহ থেকেই তার পরিপূর্ণ আয়োজন নিয়ে এসেচেন। তবে, ভবিষ্যতে আপনার শরণ নেবো বৈ কি। চাল, ডাল, নুণ, তেল ··

কোথায় সংগ্রহ করতে হবে, এ দুশ্চিন্তার দায়ে আমি বাড়ীর বাইরে পা দিতে বড় রাজী হই না। সুশৃঙ্খল গেরস্থালীতে চিরাভ্যস্ত আরামের মধ্যে বাস করে ভুলে যাই যে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সংগ্রহ করবার জন্য বুদ্ধি চাই, শক্তি চাই—এবং তা অমানুষিক রকমের।

পাচক আসিয়া জানাইল, বাহিরের টেবিলে দু'পেয়ালা চা দেওয়া হইয়াছে।

অনিশ কহিল—আসুন।

কান্তিবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেচেন।···

একাদশ পরিচ্ছেদ

অজানার সঙ্গে

কাছারি হইতে ফিরিয়া অনিশ পোষাক ছাড়িতেছে, কান্তিবাবু আসিয়া কহিলেন,—জ্বালাতন করতে এলুম, অনিশবাবু!

—বিলক্ষণ! বসুন, বসুন···বলিয়া অনিশ একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল।

কান্তিবাবু কহিলেন,—বসলে আমার চলবে না তো! আমি এসেচি ভিক্ষার্থী হয়ে···

হাসিয়া অনিশ কহিল—কি ভিক্ষা, বলুন···

কান্তিবাবু কহিলেন—আপনার ভৃত্যকে একবার ছেড়ে দিতে হবে,—আমার লোককে এথনি বাজারে পাঠাতে চাই। চাল এবং ঘী এই দু'টি বস্তুর এথনি দরকার।

অনিশ কহিল—চাকরকে পাঠালে তো চলবে না। হরসুখকে বলি··· সে এখনো ফেরেনি। তবে এলো বলে···

কান্তিবাবু কহিলেন—তাহলে একটু বসি···

কান্তিবাবু বসিলেন। অনিশ কহিল—চা-রুটী ফরমাশ করি?···

কান্তিবাবু কহিলেন,—না, না, না···ভারী মনে করিয়ে দিয়েচেন, বটে! আপনার এখানে সেদিন চায়ের যা দশা দেখলুম, বাড়ীতে তাই বলছিলুম···আহা! আসাম থেকে এসে ভাগলপুরে এমন শ্রী ধারণ করবে, চা তা ভাবেও নি! মেড়ুয়া বামুন তো, সে চায়ের মূল্য কি বুঝবে! তা,

যদি আদেশ করেন, তাহলে আপনার দু'বেলার চা আমার ওখান থেকেই নয় আসে। আমার স্ত্রী চায়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে মমতায় গলে এই প্রস্তাব পাঠিয়েচেন !...

অনিশ হাসিয়া কহিল,—আপনি তাহলে আমার আতিথ্যের নিন্দা করেচেন গৃহে ফিরে ?

কান্তিবাবু কহিলেন,—তাকে নিন্দা বলতে হয়, বলুন—কিন্তু সত্য কথাই বলেচি। সত্য বলতে বসে প্রিয়-অপ্রিয় বিচার-বোধ-সম্বন্ধে আমি তেমন সচেতন থাকতে পারি না! আপনাকে সেদিন তার পরিচয়ও একটু দিয়েচি বোধ হয়! এই দোষে গৃহিণীর কাছে চিরদিন অখ্যাতি রয়ে গেল!

অনিশের বুকের কোণে আঘাত লাগিল।...গৃহিণী! সকলেই গৃহিণীর কথা স্তুতি বা পরিবাদচ্ছলে বলিয়া থাকে, শুধু সে-ই...! বেচারা সে!... সে কোনো জবাব দিল না।

কান্তিবাবু কহিলেন,—কাছারিতে আজ কি কার্য্য করে এলেন? চিম্‌সেলালের সম্পত্তি ভিরমিচাঁদকে দেবার ব্যবস্থা, না, ছাতুলালকে পিষে ভূতিরামের পাত্রে তুলে দেওয়া ?...

হাসিয়া অনিশ কহিল—পেশা তাই বটে!

কান্তিবাবু কহিলেন—ভালো লাগচে এ ব্যবসা ?...আমার তো ভাবতে গা শিউরে ওঠে! নিজের দু'পাই দেড় ক্রান্তির হিসাব রাখতে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাই...আর এ পরের হিসেবের জঞ্জাল ঘেঁটে ভেল্‌কি খেলা!...বাপ্!

বেশ-পরিবর্ত্তনান্তে অনিশ মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া বসিল। কান্তিবাবু ডাকিলেন,—ওরে জোগুয়া...আপনার বাহনটির নাম জোগুয়াই তো ?

—হাঁ।

জোগুয়া আসিল। কান্তিবাবু কহিলেন,—একটু চিঠি লিখে দি··· যা তো বাপু চিঠি নিয়ে ঐ পাশের বাংলায়। ডাকবি, মা-জী···ডাকলে যাঁকে দেখবি, তাঁর হাতে এই চিঠি দিয়ে খানিকক্ষণ বসবি, তার পর আমার বাড়ীর কিষণার সঙ্গে সেই মা-জী যা দেবেন, তা নিয়ে চলে আসবি···বুঝলি ?

জোগুয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

কান্তিবাবু কহিলেন,—একটু কাগজ আর পেন্সিল, কিম্বা কলম··· দেবেন তো !

অনিশ কহিল—কি লিখবেন, শুনি ?

কান্তিবাবু কহিলেন—প্রণয়-লিপি ! আপনি তো খাশা লোক, মশায়,—শুনলেন, স্ত্রীকে চিঠি লিখচি ! কি লিখচি তা জানবার কৌতুহল ? এ যে বিষম ব্যাপার !

কাগজ-কলম আসিল। কান্তিবাবু লিখিলেন,—

দেবী, দু'পেয়ালা চা এ বাড়ীর জন্য পাঠাইবে। সেই সঙ্গে···অতিরিক্ত ইঙ্গিত দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা-বোধে ক্ষান্ত রহিলাম। · তি

কান্ত

চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া জোগুয়ার হাতে দিলে জোগুয়া বিদায় লইল।

কান্তিবাবু কহিলেন—ভালো কথা, আপনার একটা পরিচয় আপনি গোপন রেখেচেন !···

অনিশ কহিল,—কি, বলুন তো ?

কান্তিবাবু কহিলেন—যে···আপনি মস্ত লেখক। বাংলা মাসিক-

পত্রের মারফৎ বাঙালীর চিত্ত-বনে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ অজস্রধারে বিতরণ করেন! আমার স্ত্রী আপনার নাম শুনে বললেন—যে-অনিশবাবু লেখেন, ইনিই তিনি না কি?...তা...

অনিশ সলজ্জভাবে কহিল—আমিই লিখি বটে! ভারী তো লেখা! হুঁঃ! একলা, সময় কাটানোর জন্য...

কান্তিবাবু কহিলেন—আমায় বলেন নি তো সে কথা! জানলে দেখতে চাইতুম...

অনিশ কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—সে দেখাবার বস্তু নয়!

কান্তিবাবু কহিলেন—নাঃ! মাসিক-পত্রে কি অমনি-অপনি ছাপে?

অনিশ কহিল,—আপনি জানেন না,মাসিক-পত্রের পাঠক-পাঠিকারা হলেন বর্ণ-পরিচয়ের গোপাল—যা পান্, তাই খান্। কাজেই সম্পাদক মহাশয়রাও যা পান, তাই ছেপে তাঁদের হাতে তুলে দেন!...

কান্তিবাবু কহিলেন—বাঙালীকে এমন হীন অপবাদ দেবেন না! তা যদি হতো, বাঙ্‌লায় তাহলে সকলেই লেখক হতো, পাঠক-পদার্থর অস্তিত্বও থাকতো না! কতক লোক লিখতে পারেন না বলেই দায়ে পড়ে পাঠক হয়ে ওঠেন! তাঁদের পড়ার ইচ্ছা প্রবল এবং পড়ে ভালো লেখার তারিফও করেন চমৎকার!

অনিশ কহিল—আপনার মত পাঠক পাওয়া হলো লেখকের সৌভাগ্য!

কান্তিবাবু কহিলেন—লেখা পড়িয়ে তার প্রমাণ দিন।

অনিশ কহিল—সে একদিন হবে'খন। আজই যদি সে লেখা আপনার হাতে ধরে দি, তাহলে কাল থেকে ভুলেও আর এ-পথে আপনি পদার্পণ করবেন না।

কান্তিবাবু কহিলেন—ছি ছি, অমন কথা বলবেন না।...এখন সুবোধ

শান্ত বালকের মত লেখাগুলি এনে দিন তো। এ অনুরোধ করতুম না—কিন্তু গৃহিণীর সুব্যবস্থায় পুরানো পত্রিকার একখানিও এখানে আসেনি। এলে তা থেকেই এ দু'দিনে আপনার কবিতার রস নিঃশেষে পান করে ফেলতুম!

কান্তিবাবু নাছোড়বন্দা। অগত্যা অনিশকে ক'খানা মাসিক-পত্র আনিয়া তাঁর সামনে ধরিয়া দিতে হইল। কান্তিবাবু সূচী দেখিয়া অনিশের লেখা পাইয়া পড়িতে সুরু করিলেন। অনিশ পাশে বসিয়া রহিল—লজ্জায় সঙ্কোচে। উত্তেজনায় চিত্ত তার মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল।...

জোগুয়া আসিল, সঙ্গে কিষণ—দু'জনের হাতে কাঠের ট্রে। ট্রেতে চায়ের পেয়ালা ও চা-দানি এবং বড় ডিশে কতকগুলা নিমকি, সিঙাড়া ও পান্তুয়া।

অনিশ কহিল—ব্যাপার কি এ?

কান্তিবাবু কহিলেন—সব ঘরের তৈরী। গৃহিণীর নিপুণ গৃহিণীপনার প্রত্যক্ষ সরস নিদর্শন। তা, অস্বীকার করবো না...শরীরখানি এই দেখচেন তো, ভুঁড়ি গজায়নি, চুলেও তেমন পাক্ ধরেনি! খাশা আছি! আধ সের মাংস অনায়াসে পরিপাক করি—চোঁয়া ঢেঁকুর কাকে বলে, তা জানবার অবসর ঘটেনি। আর মন? বয়স চল্লিশের কোঠা পার হলেও মন দস্তুরমত সবুজ! নয় কি?...বাঙালীর জীয়ন-কাঠি তার স্ত্রী...লোকে এ কথা যে বলে, তা ভারী ঠিক! সেই জন্যই আপনার স্ত্রী এখানে নেই শুনে বেদনায় আমার মন রী-রী করে উঠেছিল। এমন বাসনাও হয়েছিল যে যতদিন আপনার গৃহিণী ফিরে না আসেন, ততদিন আপনাকে ধরে আমার ওখানে আটকে রাখি। চাকর-বামুনের হাতে পড়ে থাকা আর অনাথ-আশ্রমে বাস—এ দুয়ে কোন পার্থক্য নেই।

অনাথ আশ্রমে তবু দু-চারজন সঙ্গী মেলে—আর এ···? ওঃ, এ দুঃখ কহতব্য নয়!

এ কথায় অনিশের বুকের মধ্যটা অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।···কান্তিবাবুর উপর শ্রদ্ধায় মন তার নত হইয়া পড়িল। কি চমৎকার দিলখুশ্ লোক! আলাপে এমন সরসতা···এঁর তুল্য লোক সে আর কোথাও দেখে নাই। একটু তৃপ্তিও হইল···তার দারুণ নিঃসঙ্গতার আঁধারে কান্তিবাবু যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্য-কিরণ! প্রাণে আলোর সঞ্চার হয় যেমন, তেমনি স্বাস্থ্যের আব-হাওয়ায় মনকে ভরপূর করিয়া তোলে! কেন না হইবে? পাশে যার প্রেমময়ী পত্নী, তার কোথাও যে কোনো অনুযোগ অভিযোগ থাকিতে পারে না। ব্যবসা? অর্থ-চিন্তা? সব জঞ্জাল প্রেয়সী পত্নীর হাসির কিরণে উবিয়া যায়!

কান্তিবাবু কহিলেন,—নিন্, চা খেয়ে নিন্। আর সেই সঙ্গে ঐ তুচ্ছ পদার্থগুলো···

অনিশ কহিল,—এই যে খাই!···তবে এজন্য আমি বড় কুণ্ঠিত হচ্ছি। কেন অনর্থক ওঁকে কষ্ট দিলেন, বলুন তো?

কান্তিবাবু কহিলেন,—আপনি বোঝেন না, লোককে খাওয়াতে পেলে নারী-জাতটা এমন আনন্দ পায় যে তেমন আনন্দ সে প্রবাসী-স্বামীর চিঠি পেয়েও বোধ করি পায় না! অবশ্য যারা অন্তরে-বাহিরে নারী, আমি তাঁদের কথাই বলচি। না হলে বাহিরে নারী আর অন্তরে যাঁদের পুরুষের সঙ্কীর্ণতা, তাঁদের নারী বলে স্বীকার করে নারী-জাতির অপমান আমি করতে চাই না।···

অনিশ কহিল—ঐ হরসুখ এসেচে। আপনার বাজারের ব্যাপারটা শেষ করা যাক···

হরসুখ আসিলে অনিশ তাকে কথাটা বুঝাইয়া বলিল হরসুখ বলিল,—বহুৎ খুব।

কান্তিবাবু কহিলেন,—উনি এইমাত্র এলেন…

হরসুখ কহিল,—কুছ পরোয়া নেহি, বাবু।…

কিষণ সেইখানেই ছিল। কান্তিবাবু তার হাতে টাকা দিয়া কহিলেন,—বাবুর সঙ্গে যা। কুলির মাথায়…না, না, একটা একা নিস্ রে। বাবু আর তুই, মাল নিয়ে দু'জনে একাতেই আসবি।…

হরসুখ কিষণকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অনিশ কহিল,—বেড়াতে বেরুচ্ছেন?

কান্তিবাবু কহিলেন,—এখনো অবকাশ মেলেনি। গৃহখানিকে বহু কশরতে সম্প্রতি বাসযোগ্য করে তোলা গেছে। এবার গৃহের বাহিরে চেয়ে দেখবার ফুরসৎ মিলবে।

অনিশবাবু কহিলেন,—কাছাকাছি বেড়াবার চমৎকার একটি জায়গা আছে—শাজঙ্গী…ঐ একটু আগেই রেল-লাইনের তলা দিয়ে ওদিকে যে পথ গেছে, ঐ পথেই খানিক গেলে শাজঙ্গী মিলবে। মস্ত একটা পুকুর—এপার ওপার দেখা যায় না। পাশেই উঁচু পাহাড়ের মত একটা ঢিপি।…নির্জ্জন জায়গা…ভারী ভালো।…

কান্তিবাবু কহিলেন,—যাবেন? না, মক্কেলের আশায় আসর সাজিয়ে বসে থাকতে হবে?

অনিশ কহিল,—না, চলুন। আসবার যারা, তারা আসে রাত আটটা নাগাদ।

কান্তিবাবু কহিলেন,—তাহলে তৈরী হন্। আমি গৃহে সংবাদ দিই গে…মানে, আমার গৃহিণীও সঙ্গে যাবেন…বিদেশে স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালন করতে এসেচি, তাই বা সস্ত্রীক পালন না করি কি বলে?…আমার

গৃহিণী আছেন, আর একটি উপসর্গও সঙ্গে আছেন···সম্পর্কে আমার ভগ্নী···তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যই বিশেষ করে আমাদের এখানে আসা!··· আপনার আপত্তি হবে?

অনিশ কহিল—আমার আপত্তির কথা বলচি না! তাঁরা কুণ্ঠিত হতে পারেন। আপনার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে, হঠাৎ তার মধ্যে একজন অপরিচিত বাইরের লোক···

কান্তিবাবু কহিলেন,—অপরিচিত! তাতে কি? দেখা হয় নি বলেই অপরিচিত। পরিচয় হতে কতক্ষণ?··বাইরের লোক! ঘর ছেড়ে বাইরেই যখন এসেচি, তখন পরিচয়ের জন্য ঘরের লোক এখানে পাবো কি করে, বলুন তো? পরিচয় করে বাইরের লোককেই ঘরের লোক বানিয়ে তুলতে হবে এখন!···

এঁর সবই অদ্ভুত! বাঃ! পরিচয়ের পৃষ্ঠা যত বাড়িয়া চলে, কান্তি-বাবুর প্রতি অনিশের মন ততই আকৃষ্ট হয়। তার আপত্তি টিঁকিল না। তাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য তৈয়ার হইতেই হইবে!··

কান্তিবাবু আসিয়া কহিলেন,—ওঁরা তৈরী হয়ে বাড়ীর বার হয়েচেন। ···আসুন।

অনিশ আসিল।···

কান্তিবাবু কহিলেন,—ইনি আমার গৃহিণী···যাঁর পরিচয় চায়ের পেয়ালায় আর মিষ্টান্নের প্লেটে ইতিপূর্ব্বেই পেয়েচেন। দু'দিন সবুর করুন—প্রতিভার নব নব উন্মেষে আপনাকে উনি একেবারে সচকিত চমৎকৃত করে দেবেন, অকুতোভয়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করচি। আর উনি···? না, ওঁর সম্বন্ধে আমার কোনো কথা বলতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চা হবে। ওঁকে আমাদের সঙ্গিনী বলেই জানবেন।··· তাতে কোন ক্ষতি হবে না। কারণ আমার গৃহে আতিথ্য নিলে তা

চরিতার্থ করার, সম্পূর্ণ ভার আমার গৃহিণীর হাতে এবং সে অধিকার উনি স্বর্গের বিনিময়েও হস্তান্তর করতে নারাজ!

কান্তিবাবুর গৃহিণী অন্তরালে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তাঁর চোখে ভৎ´সনার মৃদু বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

কান্তিবাবু কহিলেন,—এক-পশলা হয়ে গেল অন্তরালে···

অনিশ আকাশের দিকে চাহিল। হাসিয়া কান্তিবাবু কহিলেন,—বৃষ্টি নয়, আমায় ভৎ´সনা ··

অনুচ্চ কণ্ঠে গৃহিণী কহিলেন,—কি যে বকো!

কান্তিবাবু কহিলেন—Peace! Peace! দাম্পত্য-কলহ ঘরে যত কাব্যের সৃষ্টি করুক, পথে তা অশোভন। ঠিক!···

কয়জনে শাজঙ্গীতে আসিয়া পৌঁছিলেন—অনিশ একটু দূরে দূরে অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে চলিয়াছিল। কান্তিবাবুর উচ্চ হাস্য মাঝে মাঝে তাকে সচকিত করিতেছিল—বুকের সেই বেদনার জায়গায় বেশ জোরেই তা বাজিতেছিল। তারো জীবন এমনি মধুময় হইতে পারিত···শুধু একটু দরদের অভাবে মনকে একেবারে গেরুয়া পরাইয়া নির্জ্জন-বনচারী সন্ন্যাসী করিয়া রাখিয়াছে! কমণ্ডলু সম্বল করিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়াছে!

মন তাতিয়া উঠিল। কেন? কেন?···পরের দোষে নিজের জীবনকে অনিশ এ-ভাবে নষ্ট করিবে কেন?···না।

দুনিয়ার এই অজস্র শোভা, সৌন্দর্য্য, বনানীর এই অপরূপ সুষমা—ঐ নীল আকাশ, কালো জল, ফুল, ফল—এ-সবের কোনোটাই তো সন্ন্যাসের পথে সঙ্কেত দেয় না! এরা যে কেবলি বলে, সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর জীবন,···হেলায় উপেক্ষা করা ঠিক নয়। ··বধূ কি মেলে না? প্রাণের প্রিয়া···? যে তার অতি-ক্ষুদ্র বেদনার্ত্ত নিশ্বাসের হাওয়ায় ম্লান মুখে কাতর চোখে তার পানে ফিরিয়া চাহিবে? এই কান্তিবাবু···

কি সুখী···কি আনন্দেই না জীবনের পথে বিচরণ করিতেছেন! দুনিয়ার যত ফুল তাঁর চলার পথে পাপড়ি বিছাইয়া দিয়াছে—পায়ে কঠিন কাঁকরটুকুও যাহাতে না বাজে! আঃ!···

কান্তিবাবু কহিলেন—খাশা জায়গা! যেমনটি চাই···জল, আকাশ, ঘাস, আর নিরালা···a beau y spot! আপনার একটা গান হোক··· গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—তোমাদের বলা হয়নি, অনিশবাবুর হাতের তুলিই শুধু ছবি আঁকে না, ওঁর কণ্ঠেও সুরের ছবি ফোটে।··· শুনচেন অনিশবাবু, গৃহিণী অনুরোধ করচেন, একখানা গান শুনিয়ে দিন···

কান্তিবাবু ছাড়িবার পাত্র নন্। অনিশকে গাহিতে হইল। গান শুনিয়া কান্তিবাবু কহিলেন,—চমৎকার!···

কান্তিবাবুর গৃহিণী অস্ফুট স্বরে কান্তিবাবুকে বলিলেন,—আর একটা গাইতে বলো ··

কথাটা অনিশের কাণে গেল না। সে লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া ইঁহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল।

কান্তিবাবু কহিলেন,—তুমি বলো না। আমি কাঁহাতক ইণ্টারপ্রিটারী করি!···আলাপ করো···ভদ্রলোক কি মনে করবেন!

আলাপ হইল। কান্তিবাবু কহিলেন,—ঘুরে বসুন্ মশায়। বলি, ও অনিশবাবু···এ কি বেহারী কেতা? এঁদের দলে এসেচেন, অথচ এঁদের দিকে মুখ ফেরাবেন না! এঁরা এমন কুৎসিত নন্ যে আপনার মানসী কল্পনা ঘৃণায় সিঁটিয়ে উঠবে—বুঝলেন!

আঃ! কি পাগলের মত ইনি বকেন! সলজ্জভাবে অনিশ ফিরিয়া বসিল। হাসিয়া কান্তিবাবু কহিলেন,—মুখ তুলুন···আলাপ করিয়ে দি···

কম্পিত দৃষ্টিতে অনিশ চাহিল। কান্তিবাবু কহিলেন—আপনি যে সেকালের বর সেজে আসরে বসলেন!…আঁখিপল্লব কাঁপিছে সঘনে!…

পরিত্রাণ নাই! হাতে পাইয়া এ ভদ্রলোক তো…হাসিয়া অনিশ কহিল—বলুন—এই তো চেয়েছি…

কান্তিবাবু কহিলেন,—নারী আর প্রকৃতি · এ দু বস্তুই অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী কবিদের প্রধান দর্শনীয়! তা, তাল-তমাল তো প্রচুর দেখেচেন, একবার নারীকেও দেখুন…শুভদৃষ্টি হয়ে যাক…

কান্তিবাবুর হাঁটুতে তাঁর গৃহিণী মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অনিশ তা দেখিল। কান্তিবাবু কহিলেন—ব্যস্…সর্ব্বক্ষণ শাসন! বাপ্‌রে! আচ্ছা, এবার ভদ্র হচ্ছি।…ইনি হলেন সুকবি শ্রীযুক্ত অনিশচন্দ্র মিত্র, ভাগলপুরের নব্য উকিল…আর ইনি আমার গৃহিণী শ্রীমতী চিত্রা চৌধুরাণী…সুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী, সুগৃহিণী চ!… তার পর গৃহিণীর পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—নাও, কি বলছিলে ওঁকে…বলো…

চিত্রা চৌধুরাণী কহিলেন—আপনার বেশ গলা। আর একখানা গান……

কান্তিবাবু কহিলেন,—আপনার লোকসান হবে না তাতে…আর একটা গান গাইলে তার মূল্য পাবেন…

হাসি ও ভৎর্সনা-ভরা দৃষ্টিতে চিত্রা স্বামীর পানে চাহিলেন। কান্তিবাবু কহিলেন—বাঃ, তা আমার সহ্য হবে কেন! ওঁর গানের তারিফ উনি পাবেন, আর আমার ভাণ্ডারে যে-রত্ন আছে, তার পরিচয় আমি দেবো না …?

চিত্রা চৌধুরাণী ভৎর্সনা করিলেন,—আঃ!

কান্তিবাবু একটু সরিয়া বসিয়া কহিলেন—গৃহিণীও সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন, এবং ওঁর কণ্ঠও…

চিত্রা উঠিয়া আসিয়া স্বামীর ঠোঁট চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর কুণ্ঠা-হীনতা দেখিয়া অনিশ বিস্মিত হইল, মনে পুলকের প্রবাহ ছুটিল। এই বেশ! স্বামী-স্ত্রীর এই সহজ স্বচ্ছন্দ আলাপ···তবু সে একটা বাহিরের লোক এখানে বসিয়া!···আর শোভা? স্বামীর কাছে নির্জ্জন কক্ষে মুখের ঘোমটা খুলিতে লজ্জায় মরিয়া যায়!···জানোয়ার!···

অনিশ গাহিল। তার পর কান্তিবাবুর হাতে চিত্রা চৌধুরাণীর মুক্তিলাভ ঘটিল না। তাঁকেও গাহিতে হইল। গানে-আলাপে নিমেষে একটা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হইল।···

তার পর ফিরিবার পথে চিত্রা অনিশকে কহিলেন,—কাল সকালে আমাদের ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো। ভয় নেই, গানের জন্য অনুরোধ করবো না। কেন না, সে সময় আপনার সঙ্গে যাদের কাজের চুক্তি-সম্পর্ক···

হাসিয়া অনিশ কহিল,—মক্কেলের আর আমার? উভয়েরি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এত দাম মক্কেলের দল এখনো টের পায়নি—কাজেই আমার অবসর অখণ্ড!···

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুঃখিনী

পরের দিন সকালেই অনিশ গিয়া কান্তিবাবুর দ্বারে করাঘাত করিল। কান্তিবাবু বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—ইস্, আপনি ভারী লক্ষ্মী ছেলে, দেখ্‌চি! আমি ভাবছিলুম, বুঝি, ডাকতে যেতে হবে!

অনিশ একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল,—এত ভোরে আসা...কিন্তু কি করিবে? কাল যে আনন্দ পাইয়াছে, ইঁহাদের স্নেহে আর সাহচর্য্যে যে, তার নিঃসঙ্গ বেদনাদগ্ধ চিত্ত নিমেষ বিলম্ব সহিতে পারিতেছিল না। রাত্রে কতবার তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—ভাবিয়াছে, দেরী হইয়া যাইবে না তো চায়ের নিমন্ত্রণে হাজিরা দিতে?

কান্তিবাবুর কথায় হাসিয়া সে কহিল,—মানে, আমি রোজ ভোরে একটু বেড়িয়ে আসি...। ভাবলুম, আপনারা যদি বেড়াতে যান্...

কান্তিবাবু কহিলেন,—ক্ষেপেচেন! আমরা এখানে হাওয়া খেতে এসেচি! এত ভোরে যাওয়া সম্ভব হয় কখনো? আগে রোদ উঠুক.. চা-টা খেয়ে সাজসজ্জা করি.. তবে বেরুবো।...অর্থাৎ, ও-রোগটা আর ধরতে চাই না। একবেলাই ভালো। না হলে হাওয়া খেয়েই থাকতে হবে—গৃহ-সুখ ভুলে যাবো। তা, আপনি কি এখন বেড়াতে যাচ্ছেন?

মুস্কিল! কি যে বলা যায়! অনিশ কহিল,—আপনাদের যদি যাওয়া না হয়, তাহলে নয় আজ নাই গেলুম...

কান্তিবাবু কহিলেন—কোনো রকম অসুবিধা হবে না তো? শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য?

—নাঃ!

কান্তিবাবু কহিলেন,—প্রিয়া-বিরহে রাত্রে নিদ্রা তেমন জুৎসই হচ্ছে না,—না? তাই সকালেই একটু···

সলজ্জভাবে অনিশ মৃদু হাসিল। এটুকু অভিনয়ের খাতিরে। মনের মধ্যে কিন্তু তখন কে যেন বোমা দাগিতেছিল!···

কান্তিলাল কহিলেন,—তা, বসুন···আমি এখনি হাজির হচ্ছি দরবার-হলে।

কান্তিলালের বাংলার বাহিরে মস্ত একটা হল্। হলের একধারে একখানা তক্তাপোষ পাতা, আর তার পাশে একখানা বেঞ্চ ও একটা টেবিল। কান্তিলাল একটা সতরঞ্চ আনিয়া তক্তাপোষে বিছাইলেন, বিছাইয়া কহিলেন—আপনি বসুন···আমি মুখ ধুয়ে এখনি আসচি।

অনিশ বসিল··বসিয়া বাহিরে পথের পানে চাহিয়া রহিল। বাংলার হাতার বাহিরে ঠিক পথের উপর মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ, তার পাশে কুলের আর খেজুরের চারা।··তার ওধারে একটা বাবলা-ঝাড়। বাবলা ঝাড়ের পরেই একটা খানা, খানার পাশে অনিশের বাংলার হাতা। সবুজ ঘাসে ছাওয়া খানিকটা খোলা মাঠ,—মাঠের বুক ফুঁড়িয়া ঘুটিংয়ের পথ, তার পর সিঁড়ি।···অনিশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, তার যদি তেমন ভাগ্য হইত তো আজ ঐ বাঙলার সবুজ ঘাসে-ছাওয়া মাঠটি অনিশের প্রিয়তমার চরণধ্বনির কি কুহকেই না ভরিয়া থাকিত!··· এই যে কান্তিবাবু···তাঁর গৃহিণীটি সত্যই সুহাসিনী, সুভাষিণী,··· সুমধুর-হাসিনী!·এ সব তপস্যার ফল!··

হঠাৎ একটা চাবির আওয়াজ···অনিশ ফিরিয়া চাহিল,—চকিত চরণে এক কিশোরী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে পলাইল। বোধ হয়, বাহিরে আসিতেছিলেন এবং আসিয়া অনিশকে দেখিবামাত্র·

কিশোরীর শাড়ীর টক্‌টকে লাল পাড়টুকু বিদ্যুতের চমক দিয়া অন্তর্হিত হইল!…অনিশ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল।…

কান্তিলাল আসিয়া কহিলেন,—আমি হাজির। গৃহিণী নিবেদন জানালেন, তাঁকে একটু ক্ষমা করতে হবে, তাঁর হয়তো একটু বিলম্ব ঘটবে…

অনিশ কহিল—সেজন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমিই ঢের আগে এসেচি কি না!…তার মানে, আপনাদের বিব্রত করলুম, বোধ হয়!

—বিলক্ষণ! আপনি না এলে আমাকে এ পাঁচ মিনিট বাদে আপনার ওখানে যেতে হতো! তার চেয়ে…এই অবধি বলিয়া কান্তিলাল হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—আমার ছুটোছুটিটা বন্ধ করেচেন, আপনার কাছে সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

অনিশ কহিল,—যাক,—আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না তো? নতুন এসেচেন,…কোনো দ্বিধা করবেন না—আমি পাশেই আছি, বুঝলেন তো! আমি পাশে থাকতেও যদি আপনাদের কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করতে হয় তাহলে আমি তাতে ভারী লজ্জা পাবো।…

কান্তিলাল কহিলেন—সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলেই কাল পরিচয় করে দিছি তো। তিনি বাস্তবিক সুগৃহিণী! কাল রাত্রেই তিনি আমায় বলেচেন, অনিশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালোই হলো…পশ্চিমে এসে শুধু হাওয়া খেলেই তো চলবে না…কোনোরকম অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হলে হাওয়া খাওয়ার সুযোগ লাভ করা যায় না। তা ওঁর দৌলতে অস্বাচ্ছন্দ্য-ভোগে বিড়ম্বনায় পড়চি না!…তবে একটা আশঙ্কাও…

আশঙ্কা? অনিশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

কান্তিলাল কহিলেন—আশঙ্কার কথা এই, গৃহিণী বলছিলেন, উনি কবি—এবং কবিরা যে-রকম উদাসী আর সংসার-জ্ঞানহীন হন···

অনিশ কহিল—আমার গৃহস্থালী দেখলে কি তাই মনে হয় ? বলুন··· এ যে অবিচার আমার উপর...তাহলে আমার মিনতি, উনি দয়া করে আমার ছোট গৃহস্থালীটুকু যেন দেখে আসেন ! সে তো আমারি এই আনাড়ি হাতে···

কান্তিবাবু কহিলেন—বড় উকিলের এমনি যুক্তি বটে ! দু'দিন নয় আপনার গৃহিণী প্রবাসিনী হয়েচেন, গোছানো তো তাঁরি হাতে···

অনিশ সতর্ক হইল, কহিল,—তা বলতে পারেন। তবে বিশৃঙ্খলা তো ঘটাইনি সে-শৃঙ্খলার মধ্যে !

কান্তিবাবু কহিলেন,—এটা মস্ত সার্টিফিকেট,—তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো। যেহেতু ঐ একটা বিষয় নিয়ে আমাদের অশান্তি-কলহের আর কোনদিনই অন্ত ঘটলো না। আমার দরকারী কাগজ-পত্র, বই, পুঁথি, সব গুছিয়ে আমি সাম্‌নের টেবিলে জড়ো করলুম—ফিরে এসে দেখি, গৃহিণী সেগুলি তাঁর ভাঁড়ার-ঘরের শেল্‌ফে তুলে দিয়েচেন ! আমি যেই আবার পেড়ে আনলুম, অমনি তিনি গেলেন চটে···বললেন, —সামনেই ওই ছেঁড়া কাগজ-পত্তর ? ছি ! টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স রাখলুম, কি সেণ্টের শিশি, ফুলদানী, এই সব থাক্, তা নয়, কতকগুলো ছেঁড়া বই-খাতা···! বিপদ এইখানে ! বহু বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল হয়ে গেল দুজনের, কিন্তু ঐটুকুতেই বিরাট স্বাতন্ত্র্য ! এই স্বাতন্ত্র্য নিয়েই যত কলহ ! ভাবি, থাক্ একটু, নাহলে দাম্পত্য-জীবনে বৈচিত্র্য থাকবে না, নেহাৎ একঘেয়ে হয়ে পড়বে।

চিত্রা আসিয়া কহিলেন,—কিসের গল্প হচ্ছে ?

কান্তিলাল কহিলেন—তোমার দুঃখের কথা বলচি। এত

আমার দোষ-ত্রুটিগুলো শুধরে তুলতে পারলে না· ·আমার ঐ বই-খাতার জঞ্জালের জ্বালা চিরদিন সহ্য করে···

হাসিয়া চিত্রা কহিলেন—থামো!···একটু রয়ে-বসে পরিচয়টুকু ব্যক্ত করতে হয়। এখন কত কাল থাকতে হবে এখানে, কে জানে! এর মধ্যেই যদি অনিশবাবুকে গুণের পরিচয় নিঃশেষে বলে ফ্যালো তো ওঁর প্রাণে বিভীষিকা জাগতে পারে···এবং তার ফলে আমাদের গৃহে উনি এমন দুর্লভ হয়ে পড়বেন যে, আমাদের পক্ষে এই প্রবাস-বাস দ্বীপান্তর-বাসের তুল্য হবে।···

কান্তিলাল কহিলেন—বেশ, ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করচি।

চিত্রা কহিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম, অনিশবাবু,—চায়ের সঙ্গে আপনাকে রুটী, ডিম—এই দেবো? না, আমাদের স্বদেশী গজা, সুজির লাড্ডু, লুচি, ভাজা দেবো? শেষেরগুলো অবশ্য বাড়ীর তৈরী।

কান্তিলাল কহিলেন—দুইই যদি দিতে পারো, তাহলে বেশ এ্যাংলো ভার্ণাকুলার ষ্টাইল হয়···

চিত্রা কহিলেন—তুমি থামো না, বাবু! তোমার মতামত আমি জানতে চাইনি। বলুন তো অনিশবাবু—

অনিশ বিপদে পড়িল,···কি বলিবে? সহসা বুদ্ধি জোগাইল, হাসিয়া অনিশ কহিল—কোনটাই তো উপেক্ষার বস্তু নয়। আজ লুচি আর ভাজা হোক। স্বদেশ আগে! তার পর যদি অনুমতি হয় তো কাল ঐ রুটী, ডিম···

কান্তিলাল কহিলেন—দেখলে, উকিলের কাছে এসেচো ফন্দী নিয়ে··

হাসিয়া চিত্রা কহিলেন,—বেশ। এতে আমি সত্যি খুব খুশী হয়েচি,

অনিশবাবু। কালও আপনার নেমন্তন্ন রইলো ··শুধু কালই বা কেন? যত দিন আপনার গৃহিণী না ফিরে আসেন···কি বলেন?

চিত্রা কান্তিলালের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—তাহলে একটু বসো তোমরা, আমি এখনি আতিথ্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে আসচি···

চিত্রা চলিয়া গেলেন। অনিশ কহিল,—যদি অনুমতি পাই, তাহলে একটা নিবেদন···

কান্তিলাল কহিলেন,—অত ভূমিকা করবেন না অনিশ বাবু। বাংলা বলুন, ইংরাজী বলুন, কোনো বইয়ের ভূমিকাই আমি কোনো দিন পড়ি না। সেজন্য সমালোচনায় কথনো বিচক্ষণ হতে পারলুম না। যা বলবেন, সাফ্ বলে ফেলুন···

অনিশ কহিল—না, মানে, আমার পক্ষে সে নিবেদন যদি স্পর্দ্ধার পরিচয় বলে গণ্য না করেন, এমন সাহস যদি দেন···

—আবার ঐ ভূমিকার জের? অত চিন্তা আমি কোনো কালে করি না। উপস্থিত যখন চিন্তাশীল শ্রোতাও আপনি সাম্‌নে পাচ্ছেন না ··

অনিশ কহিল,—বেশ, তবে বলি। কথাটা এমন কিছু নয়। অর্থাৎ আমার কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছে ··

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে কান্তিলাল কহিলেন—কিসের সন্দেহ?···যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, বোহেমিয়ান গেছের···?

অপ্রতিভ হইয়া অনিশ কহিল—ছি, ছি, কি যে বলেন আপনি···

হাসিয়া কান্তিলাল কহিলেন—ভূমিকার দোষ হাতে হাতে দেখলেন তো! ওতে বক্তব্যটুকুকে বেজায় ঘোরালো করে তোলে। মানুষের angle of vision যেমন সমান নয় সকলের, angle of hearingও তেমনি। ভূমিকায় একটু গোলযোগ ঘটবেই। তাই বলচি, যা বলবেন, ভূমিকা বাদ দিয়েই বলবেন···

অনিশ কহিল—আমি বলছিলুম, আমার সন্দেহ হয় এই যে, আপনার গৃহিণী সাহিত্য রচনা করেন নিশ্চয়—কবিতা লেখা, নয় ছোট গল্প, নয় উপন্যাস, নয় আজকালকার ষ্টাইলে সাহিত্যিক বা সামাজিক সন্দর্ভ···

কান্তিলাল কহিলেন—দেখচেন, আপনি দু'দণ্ডের অতিথি মাত্র··· অথচ যে-সন্দেহ নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে আমি কখনো করিনি, আপনি তা একনিমেষে···

অনিশ কহিল—বলুন না দয়া করে। মানে, ওঁর কথাগুলিতে বেশ একটু literary touch আছে···কাল থেকেই সেটা আমি লক্ষ্য করচি।

কান্তিলাল কহিলেন,—আমি তো কৈ জানি না। স্ত্রীর সব secrets কোন্ স্বামী জান্‌তে পারে, বলুন? আমরা বাঙালী স্বামীরা অন্ততঃ এটুকু গর্ব্ব করি যে স্ত্রীর কোনো কার্য্যকলাপ আমাদের অগোচর থাকে না! কিন্তু কথাটা কি সত্য? কখনো নয়। কারণ, অকস্মাৎ দর্জ্জীর বিল বা স্যাকরার বিল এসে স্বামীর সামনে যখন হাজির হয়, তখন স্বামী অবাক হয়ে যায় যে, এ-বিলের অন্তরালে সুগভীর ষড়যন্ত্র কখন্ চলেছিল! সে-ষড়যন্ত্র স্বামীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। এ ব্যাপারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে—কি সাহিত্যে, কি সমাজে। আচ্ছা, আপনিই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কি, যে, স্ত্রীর বিরহে আপনার চিত্ত-কক্ষে যে আঁধার পুঞ্জিত সঞ্চিত হয় অহরহ, পিত্রালয়-বাসিনী আপনার স্ত্রীর চিত্ত-কক্ষেও তেমনি আঁধারের ঘনঘটা!···পারেন বলতে পুরোপূরি অকপটে?···

এ কি কথা! প্রতি পদে এমন ইঙ্গিত! কান্তিলাল তো জানেন না, কি-দুঃখে অনিশ গৃহ ছাড়িয়া এমন বিবাগী হইয়া এখানে সন্ন্যাস-আশ্রম

ফাঁদিয়া বসিয়া আছে! হায় রে, তবু একটা জবাব দেওয়া চাই! অন্যমনস্কভাবে সে কহিল,—তা কি বলা যায়!···

কান্তিলাল কহিলেন—তবে?···দেখলেন তো···এই যে গৃহিণীর প্রবেশ এদিকে, এক হাতে লুচির থালা আর এক হাতে চায়ের প্লেট··· যেন সমুদ্র-মন্থনে দেবী লক্ষ্মী উদয় হলেন, সুনীল জলধির বুক ফুঁড়ে—এক-হাতে তাঁর গরমিত চা, অপর হাতে গরম ফুল্‌কো লুচি! ওঁ আয়াহি বরদে দেবী লুচি-চা-করধারিণী···

চিত্রা আসিয়া কহিলেন,—সকাল থেকেই তোমার কাব্য-কূজন সুরু হলো! ভারী আরামে আছো, না? কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, চব্বিশ ঘণ্টা···

এই অবধি বলিয়া চিত্রা টেবিলের উপর লুচির রেকাবি ও চায়ের প্লেট রাখিলেন; পরে কহিলেন,—তোমারটা আনি···

কান্তিলাল কহিলেন,—তুমি আর নাই গেলে! আর কাকেও নয় ফরমাশ হোক্ লাজুকে···?

চিত্রা কহিলেন—লাজু লুচি ভাজচে। তার হাত জোড়া। চা সে-ই তৈরী করে দিলে।

কান্তিলাল কহিলেন,—তাহলে আমি আনচি। তুমি বসো। নাহলে অনিশবাবু ভাববেন, এরা শুধু আয়োজনই করে, খাতির জানে না।

চিত্রা কহিলেন—তাই না কি, অনিশবাবু?···

হতভম্বের মত অনিশ কহিল—না, না···

কান্তিলাল উঠিয়া গেলেন এবং নিজেই চা ও লুচির রেকাবি আনিয়া তার সদ্ব্যবহারে বসিয়া পড়িলেন।

কান্তিলাল কহিলেন—উনি তোমায় সন্দেহ করেন গো···ভীষণ ভারী সন্দেহ!

বিস্ফারিত নেত্রে চিত্রা কহিলেন,—কিসের সন্দেহ ?

কান্তিলাল কহিলেন,—আমার সামনে অসঙ্কোচে সে সন্দেহ প্রকাশ করেচেন। আমার মন, তাতে…বুঝতেই পারচো…

বিস্ময়ে চিত্ত ভরিয়া চিত্রা কহিলেন, —কিসের সন্দেহ, অনিশবাবু ?

অনিশ হাসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিল—আপনি কবিতা-টবিতা লেখেন, নিশ্চয় !

—কেন বলুন তো এত বড় অপবাদ আপনি অসঙ্কোচে একজন মহিলার স্কন্ধে আরোপ করচেন ! এখনো তবু ঘনিষ্ঠতা হয়নি ··

অনিশ কহিল,—আমার মনে হচ্ছিল ! মানে, এমন চমৎকার সরস কথা আমি কোনো মহিলার মুখে শুনিনি…

কান্তিলাল কহিলেন—নাঃ, এ শ্রদ্ধা ! আর শ্রদ্ধার এই অকুণ্ঠিত নিবেদন,…এ-সবের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় ! পাশের বাংলায় বিরহী তরুণ কবি…এ বাংলায় তরুণী গৃহিণী·· বেকুব গর্দ্দভ আমি বাক্য-বিন্যাসে নেহাৎ অপটু—নাঃ, আধুনিক গল্প-সাহিত্যের প্রথমাংশ এমন মিলচে যখন, · তখন সেই triangle-সমস্যা…

হাসিতে হাসিতে উঠিয়া চিত্রা কান্তিলালের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া দিলেন, কহিলেন—আমার সংসর্গে থেকেও মানুষ হলে না ! আজো সেই আদিম বর্ব্বরতা আর ইতরতার দিকে প্রবল ঝোঁক · হুঁশিয়ার !

কান্তিলাল কহিলেন—খুব হুঁশিয়ার ! আর কখনো মনের ভাব মুখের ভাষায় এমন ক্ষেত্রে প্রকাশ করবো না…দোহাই তোমার !…

চিত্রা হাসিয়া অনিশের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—চায়ে চিনি ঠিক আছে তো ? দেখুন…আপনার গৃহিণী এখানে থাকলে আমোদ বেশ হতো। তাঁকে আনান্…কিছুদিনের জন্যও অন্ততঃ…বুঝলেন অনিশবাবু…

পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখ মেলিয়া অনিশ চিত্রার পানে চাহিল। সে উপায় যদি থাকিত এই আনন্দ-মেলা দেখিয়া কবেকার ভোলা স্মৃতি মনের মধ্যে কি দংশন যে আবার সুরু করিয়া দিয়াছে! সে কোনো জবাব দিল না।

চিত্রা কহিলেন—লুচি আরো আনি।·· ও মিষ্টি ঘরের তৈরী···খেতে হবে। লাজু···আয় তো দিদি, দু'চারখানা গরম লুচি দিয়ে যা ভাই···

সেই লাল-পাড় শাড়ী!·· অনিশ চোরের মত বসিয়া রহিল, মাথা নীচু করিয়া···সহসা চিত্রার স্বর কাণে গেল। চিত্রা বলিলেন,—ঘাড়টা সরান্ রেকাবির ওঁপর থেকে—লাজু লুচি নিয়ে এসেচে।

মন্ত্র-চালিতের মত অনিশ মুখ তুলিয়া চাহিল—পাশেই শাড়ীর লাল পাড়ের উজ্জ্বল রক্ত-আভা···একখানি জড়োসড়ো মূর্ত্তি! দু'খানি হাত শুধু চোখে পড়িল। চাঁপার মত রঙ্···হাতে ক'গাছি সোনার চুড়ি! অনিশের রেকাবিতে লুচি পড়িল।··

তার পর অনিশ যখন ঘাড় তুলিল, তখন সে-মূর্ত্তি সরিয়া গিয়াছে।

কান্তিলাল সখেদে কহিলেন—Unhappy girl!

অনিশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কান্তির পানে চাহিল।

কান্তিলাল কহিলেন—চিররুগ্না, কেমন হাবার মত! কথা কয় কম···বিয়ে হচ্ছে না। মানে, যেমন পাত্র আমরা চাই, পাচ্ছি না। নানা দুঃখ-শোক পেয়ে ছেলেবেলা থেকে কেমন হতভম্ব-গোছ হয়ে গেছে—but still so handsome. আপনাদের কাব্যে যাকে বলে, চম্পক-বরণী! যদি কোনো দরদী শিক্ষিত পাত্র দয়া করে···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চিত্রা কহিলেন—ওর মনটুকু ভারী ভালো। মানুষের উপর কি দরদ, কি যত্ন! তবে কথা কয় ভারী কম! লেখা-পড়াও জানে···কি যে রোগ! ভাবলুম, দেশ বিদেশে ঘুরে যদি কোনো

দিন সারে! ওর জন্য এমন দুঃখও হয়!…এই লুচি ওই তৈরী করেচে, চা ওরি তৈরী। খারাপ হয়েচে কি? কথাটা বলিয়া চিত্রা অনিশের পানে চাহিলেন।

অনিশ কহিল—না। চমৎকার হয়েচে।

নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তিলাল কহিলেন,—বেচারী লাজু!…

চিত্রা কহিলেন—ওর নাম লজ্জাবতী। ভাবি তাই, নামের দোষেই মুখের কথা লজ্জায় বুঝি ওর মনের মধ্যেই বাসা বেঁধে রইলো!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বেফাঁশের ফাঁশ

তিন-চারদিন পরের কথা। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা। নিত্যকার মত পাশের বাংলায় চা পান করিয়া আসিয়া অনিশ আপনার খাশ্-মহলে বসিয়া ছিল।

দু'টী মক্কেল প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরিয়া তাদের দুঃখ-বেদনার বিস্তারিত কাহিনী নিঃশেষে উজাড় করিলে অনিশ হরসুখকে বুঝাইয়া দিল—আর্জী লেখো। এর নাম হলো লালা বসন্তরাম। বসন্তর ছোলার দোকান। গাণ্ডেরিরাম ওর দোকান থেকে ছোলা কিনেচে;—কথা ছিল, গাণ্ডেরি-রাম দামের জন্য ওদিকে একটু জায়গা বসন্তরামকে কবুলতি দেবে; তার খাজনা বছরে পঁয়ষট্টি টাকা। সে-জায়গায় একটা আস্তাবল আছে, বসন্তরামকে কেবলি চাল্ দেছে, এই বলে যে ঐ আস্তাবল উঠলেই জায়গাটা সে পাবে। আর ঐ চাল চেলে এক পয়সা দাম না দিয়ে দেড় বছরে সাতশো বত্রিশ টাকার ছোলা নিয়ে গেছে। ও টাকা চায়, গাণ্ডেরিরাম হাঁকিয়ে দেয়, বলে, আস্তাবল উঠলো বলে ভেইয়া···তা সে-সব ভূয়ো কথা। সে-কথার দরকার নেই। আর্জী লেখো, স্রেফ্ ঐ ৭৩২ টাকা ছোলার দামের জন্য। ঐ দাম মায় খরচা···ডিক্রীর প্রার্থনা হবে, বুঝলে?···

হরসুখ হাসিয়া কহিল—এৎনা বকা! হামারা খেয়াল হুয়াথা, ক্যা, এ বহুৎ ভারী মামলা রুজু হোগা।

অনিশ কহিল—ঐ তো মজা! বকায় কম? আস্তাবলের কথাই বকে গেল পাঁচ কাহন!···

কান্তিলাল আসিয়া কহিলেন—আজ এই ব্যাটা অজার পরমায়ু ফুরিয়েচে, বুঝি ?

হাসিয়া অনিশ কহিল,—আমারই পরমায়ু ফুরিয়ে তোলবার জোগাড় করেছিল।

কান্তিলাল কহিলেন—আরো দু'টি অতিথ আসচে। পথে আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, উকিল অনিশবাবুর বাড়ী কোন্ দিকে ? আমি দেখিয়ে দিলুম। এরা বাঙালী।

বাঙালী! অনিশ বিস্মিত হইল। বাঙালী মক্কেল হঠাৎ বড় বড় নামের মায়া কাটাইয়া এই সুদূর নাথনগর রোড়ে তার কাছে মাথা মুড়াইতে আসিবে! হয় সুপারিশ বহিয়া ব্যাগার চাপাইতে আসিতেছে, নয় কোনো পরোপকার-ব্রতে সহায়তা-কল্পে কিঞ্চিৎ চাঁদা! বড় গরজ না হইলে বাঙালী মক্কেল নব্য উকিলের দ্বারে পা বাড়ায় না!··

কান্তিলাল কহিলেন,—ঐ যে হাতায় পদার্পণ করেচেন···

অনিশ চাহিয়া দেখে, প্রৌঢ়-বয়স্ক দু'জন ভদ্রলোক বাঙালী। চেহারা মন্দ নয় এবং পরোপকার-ব্রতধারীদের মত মুখে তেমন প্রসন্ন হাসির ছটা নাই, তাঁদের মত গাড়ী চড়িয়াও আসেন নাই। ব্যাগারের মক্কেলই তবে!···সে হাসিয়া কহিল,—ব্যাগার ধরতে আসচে।···

হাসিয়া কান্তিলাল কহিলেন—আমাদের নিজেদের জাতটার কি সম্পূর্ণ পরিচয়ই না জেনে ফেলেচি! নিজেদের মধ্যে এতটুকু mystery নেই কোনোখানে!···

—না। বলিয়া অনিশ অতিথিদ্বয়ের পানে চাহিল, কহিল—কাকে চান্ ?

অতিথিদ্বয়ের একজন কহিলেন—আজ্ঞে, অনিশবাবু উকিলের কাছে এসেচি।

কান্তিলাল কহিলেন,—ইনিই অনিশবাবু। মুখে-চোখে আইনের লাইন্ টানা···দেখে চিনতে পাচ্ছেন না ?

যিনি কথা কহিয়াছিলেন, তিনি হাসিলেন, কহিলেন—একটু গোপনীয় কথা আছে।

অনিশ কহিল—মামলা সম্বন্ধে ? তা ও তো আমার মুহুরি আর ইনি ?···আমার বড় ভাইয়ের মত···কি মামলা ? দেওয়ানী, না, ফৌজদারী ?

আগন্তুক কহিলেন,—মামলা ঠিক নয়।

—তবে ?

—একটা বিবাহের প্রস্তাব ছিল ! ··

কান্তিলাল হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—তাতেও কি উকিলের পরামর্শ চাই·· ?

আগন্তুক কহিলেন—উকিল নিজেই যদি তাতে মূলতঃ জড়িত থাকেন, মানে, প্রধান পক্ষ স্বরূপ ?···বলিয়া মস্ত রসিকতা করিয়াছেন ভাবিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন।

অনিশ ভয়ে কাঁটা ! তার মুখে কথা সরিল না। কান্তিলাল কহিলেন—ভারী মজার তো ! কি ব্যাপার ? কথাটা ভেঙ্গে সবিস্তারে বলুন না···আমার বাসনা হচ্ছে···

আগন্তুক একবার কান্তিবাবুর পানে, পরক্ষণে অনিশের পানে চাহিলেন ; তার পর কোনো দ্বিধা না করিয়া একেবারেই বলিলেন—রমেশ বোস্ মহাশয়কে জানেন তো, এখানকার কলেজের প্রোফেশার। আমার এই সঙ্গী হলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই ; সাহেবগঞ্জের ষ্টেশন মাষ্টার। আর আমি তাঁর সম্বন্ধী···তা, ঐ রমেশবাবুর একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি ডাগর, সুশ্রী, ম্যাট্রিক অবধি পড়েচে···

সহসা বাধা দিয়া অনিশ বলিয়া উঠিল—তা আমি তো ঘটকালী করি না, এ-সব কথা আমার কাছে···

—একটু ধৈর্য্য ধরুন···বলিয়া রমেশবাবুর সম্বন্ধী কহিলেন,—তা, টহলপ্রসাদ বাবু উকিলের কাছে শুনে তিনি আমাদের পাঠালেন, অর্থাৎ আপনার বিবাহ তো এখনো হয়নি। যদি দয়া করে তাঁর কন্যাটিকে একবার···

অনিশের মুখ মরার মত বিবর্ণ হইয়া গেল। কবেকার সেই প্রথম-দেওয়া পরিচয়···প্রথম ভাগলপুরে আসিয়া স্কুল-মাষ্টারীর আমোলে টহলপ্রসাদের বাড়ী যখন প্রাইভেট টুইশনির কাজ হাতে পায়···সে-পরিচয় আজ কান্তিলালের সামনে তাকে এমন অপদস্থ করিবে, তা কি সে স্বপ্নে ভাবিয়াছিল!

কান্তিলাল কহিলেন—আপনি ভুল করচেন না তো?

সম্বন্ধীবাবুটি কহিলেন,—কিসের ভুল!···কি বলেন অনিশবাবু, একবার দেখতে হানি কি···?

অনিশ ভয়ে ভয়ে কান্তির পানে চাহিল, কান্তির মুখ-চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিয়াছে! দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

কোনোমতে কাশিয়া গলা সাফ্ করিয়া অনিশ কহিল—আপনি বি-বি-বি-বিষম ভুল কয়চেন! কার কথা বলতে···

সম্বন্ধীটি কহিলেন—ভুল কি মশায়! আজ দশ-পনেরো দিন ধরে এই কথা চলছে। টহলপ্রসাদবাবু বহুদিন থেকে রমেশবাবুকে বলচেন··· কাছারিতে তাঁর মনে থাকে না নিজে থেকে এ কথা আপনাকে বলতে। তা মেয়েটি আমার কাছে ছিল, পূর্ণিয়ায়; পরশু এসেচে। তাই কাল থেকে আমাদের জল্পনা চলছে। কালও টহলপ্রসাদবাবু কাছারিতে ভুলে গেছেন। তাঁর ওখান থেকেই আমি আসচি!···

অসম্বদ্ধ ভাবে অনিশ কি কতকগুলা মাথা-মুণ্ড যে বকিয়া গেল, তার সবটার অর্থ করা শক্ত,—তবে সেই অর্থহীন প্রলাপ-বচন ঘাঁটিয়া এইটুকু শুধু বুঝা গেল যে, টহলপ্রসাদবাবু মস্ত ভুল বুঝিয়াছেন। একবার একটি পাত্রের কথা হইয়াছিল বটে—তবে সে-পাত্র অনিশ নয়। অনিশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে কবে · ইত্যাদি।

সম্বন্ধী বাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন্। হাসিয়া তিনি কহিলেন—টহলপ্রসাদবাবুর ভুল হতে পারে না। তিনি এ-কথাও বলেচেন, যে অনিশ ছেলেটি নেহাৎ একলা থাকে—কাছে বাসা নিতে বললুম, তা সে নিলে না!···এত কথা···এতে কি ভুল হতে পারে, মশায়? আপনার এড়াবার অর্থ বুঝেচি,—আপনি ভাবচেন, মেয়ে ময়লা, অনুরোধে পড়ে শেষে

—না, না, না! অনিশ প্রবলভাবে মাথা নাড়িল।—সে কথাই নয়।

কান্তিবাবু কহিলেন—বেশ কথা, ওঁর একটু লজ্জা হতে পারে—পাত্র উনি স্বয়ং—এ স্বাভাবিকও!···তা বেশ, আমি মেয়ে দেখে আসবো'খন। কাল সকালে আপনি দয়া করে আমায় নিয়ে যাবেন। এই পাশেই আমার বাংলা। আমি এখানে নতুন মানুষ···পথ-ঘাট তো চিনি না!···

সম্বন্ধী যেন অকূলে কূল পাইলেন! কহিলেন—বেশ, আপনি দেখে এসে রিপোর্ট করবেন, তার পরে···

কান্তিলাল কহিল—কিছু ভাববেন না। মাছ যদি ভালো হয়, টোপ গাঁথবোই। আমি দু'চারটে ঘট্‌কালী করেচি, মশায়।

অনিশ কোনো কথা কহিল না। সে তখন ভাবিতেছিল, দুনিয়ায় যে-আশাটুকুকে অবলম্বন ধরিয়া আবার সে দাঁড়াইবে স্থির করিয়াছিল, বুঝি, তাও আজ ফাঁশিয়া গেল! যতই সে বুঝাক্, এ ব্যাপার আগাগোড়া

ভুলিয়া কান্তিবাবু কি নিশ্চিত নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন! আর এ-সংবাদ তাঁর গৃহিণী চিত্রাঠাকুরাণীর কাণে গেলে…

অনিশ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সম্বন্ধীবাবু সঙ্গীসহ গাত্রোত্থান করিলেন, কহিলেন,—কাল তাহলে আপনার দ্বারস্থ হবো। আমার আর তিন দিন ছুটী আছে—এর মধ্যে একটা কিনারা যদি মেলে, তবেই একটু সুস্থির হয়ে ফিরি। মেয়েটী বড় ভালো। এই বয়সে দেশের উপর কি টান্। খদ্দর ছাড়া পরবে না। খদ্দরের উপর চমৎকার দু'টী কবিতা লিখেচে! চরকায় রোজ একবার তার বসা চাই।

সঙ্গীসহ সম্বন্ধী বিদায় লইলেন। অনিশ স্তব্ধ,…কান্তিলালও তদ্বৎ। শুধু মুহুরি হরসুখ একান্তে বসিয়া মক্কেল বসন্তরামের আর্জী লেখা শেষ করিয়া টাকা-পয়সার হিসাব কষিতেছিল।…

সহসা সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনিশ ডাকিল—কান্তিবাবু…

—ডাকচেন?

—দয়া করে একবার ভিতরের ঘরে আসুন। আমার কিছু বলবার আছে। আমার দুর্ভাগ্যের মস্ত ইতিহাস…

কান্তিলাল কহিলেন—বলেন কি! এই বয়সে ওই মনের উপর দুর্ভাগ্যের ঝড় বয়ে গেছে!…

ঘরের মধ্যে আসিয়া অনিশ তার প্রাণের অশ্রু-ভরা কাহিনী কান্তি-লালের কাছে অকপটে খুলিয়া বলিল,—বাড়ীতে সকলের অত্যন্ত ইতর রকমের বিধি-নিষেধ, পত্নী শোভার পাষাণে-গড়া চিত্ত, সে চিত্তের দ্বারে অশ্রুর সাগর রচিয়া মাথা কুটিয়াও অনিশ তাকে গলাইতে পারে নাই, শেষে নৈরাশ্যের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় সে দেশত্যাগী হইয়া বহুদূরে এই ভাগলপুরে আসিয়া কতখানি দারিদ্র্য মাথায় বহিয়া কি-ভাবেই না

প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে !···চিন্তায়-অবসাদে মন প্রতি মুহূর্ত্ত পীড়িত জর্জ্জরিত হইয়াছে কতখানি—আমোদ-আহ্লাদ, সুখ, সে-সবের আশা অবধি বিসর্জ্জন দিয়া সে এই নিরাশায়-কণ্টকিত অরণ্য মধ্যে পড়িয়া আছে, এ যে কত-বড় বেদনায়, কি প্রচণ্ড মনস্তাপে···

শুনিয়া কান্তিলাল একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন,—তাই তো, ···আমায় মাপ করবেন,···না জেনে আমি আপনার মনের বড় বেদনার জায়গায় আঘাত দিয়েছি···

অনিশ কাতর মিনতির স্বরে কহিল,—না, না, কোনো আঘাত দেননি আপনি। এই দু'দিন মাত্র আপনাদের সাহচর্য্য পেয়ে আমি যেন এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েচি !···প্রতি রাত্রে কেবলি মনে হয়েচে, কখন্ সকাল হবে, আপনার গৃহে গিয়ে ঐ জীবনের মুক্ত ধারায় স্নান করবো, আপনাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে হাস্য-কৌতুকে মনের এ গুমট্-ভাব ভুলতে পারবো···

কান্তি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া কহিলেন—এ বয়সে আপনি যে সত্যই একেবারে বৈরাগ্য নেবেন, তা তো আমার বরদাস্ত হবে না। আমি কোনো রকমে যদি সাহায্য করতে পারি, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই···

বাধা দিয়া অনিশ কহিল,—অসম্ভব ! না, কান্তিবাবু, সে দুশ্চেষ্টার ইচ্ছা থাকলেও তা করতে আপনাকে আমি কিছুতেই বলতে পারি না ! ···এই অবধি বলিয়া অনিশ থামিল, পরে কহিল—আপনাকে এই দু'দিনেই যে কি-চোখে দেখেচি,···মনে হচ্ছে, যেন যুগযুগান্তর ধরে আপনার প্রীতি-স্নেহেই বেড়ে উঠেচি ! আপনার স্নেহের আশ্রয় আর প্রশ্রয় পেয়ে মন আমার যেন তার অতি-গোপন অভিপ্রায়টুকু ব্যক্ত করতে প্রগল্‌ভতার কোনো গণ্ডী মানবে না···

কান্তি হাসিলেন, তার পর সস্নেহে অনিশের পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন—বেশ তো, আমাকে আপনি তেমনি বন্ধু জেনেই অকপটে আপনার মনের সমস্ত বাসনা বা কল্পনা জানাবেন···

এটুকু শুনিয়া আশার উচ্ছ্বাসে অনিশের মন এমন দুলিয়া উঠিল যে অধীর আবেগে সে কান্তির দুই হাত চাপিয়া ধরিল ; ধরিয়া কহিল—সেই অভয় আমায় দিন, কান্তিবাবু··একদিন ভেবে-চিন্তে অকপটে আমি আমার মনের প্রতি চিন্তাটুকু যেন আপনাকে প্রকাশ করে বলতে পারি···

কান্তি কহিলেন,—তাই বলবেন। যে কটা দিন অন্ততঃ আপনার কাছে আছি, আমার কাছে কোনো কথা গোপন করবেন না। বলা যায় না কিছু, কিন্তু আমাদের প্রাচীন পুরাণে একটা কথা আছে, অমন বীর যে শ্রীরামচন্দ্র—তুচ্ছ কাঠবিড়ালীগুলো তাঁর সেতু বানিয়ে তাঁকে মস্ত সাহায্য করেছিল, যেহেতু ঐ সেতু না হলে তিনি লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে মেরে সীতার উদ্ধার সাধন করতে পারতেন কি না, সন্দেহ !···কথাটা বলিয়া কান্তি তাঁর অভ্যাসের হাসি হাসিল।

ঐ হাসিটুকু !···অনিশের মনে হইল, ও-হাসিতে স্বচ্ছ প্রাণের যেমন সহজ প্রকাশ, তেমনি কি আশার সুরও ঐ সঙ্গে বাজিয়া ওঠে !···

বাহির হইতে মুহুরি সেলাম জানাইয়া কহিল—আইনের ধারাগুলো···

কান্তি কহিল—যান্—ওদিকে call of Duty. আগে ওটা শুনুন। তার পর call of the Heart. আমি তার দিকে নজর রাখবো···

অনিশ কাতরভাবে কান্তির দিকে চাহিয়া অনুনয় জানাইল, কথাটা আপাততঃ চিত্রা দেবীর কাছে প্রকাশ না করিলেই···

তার হাত ধরিয়া হাসিয়া কান্তি কহিলেন,—সে ভাবনা নেই ! প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণাও হবে, না হলে এ কেশে তাঁর কাছ থেকে চট্ করে sympathy পাওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না। তিনি নিজে

নারী,—এ-সব case-এ নারী প্রায় নারীর পক্ষই অবলম্বন করে থাকেন কি না !···যাক, আপনি এখন বিষয়-কর্ম্ম করুন···আমি বাড়ী যাই। আজ আবার লাজুর শরীরটা খারাপ। জ্বরের মত হয়েচে রাত থেকে, শুনেচি।

—কৈ, সকালে সে কথা তো শুনিনি! বলিয়া অনিশ একটু উদ্বিগ্নভাবে কান্তির পানে চাহিল।

কান্তি কহিলেন—হয়তো ঠাণ্ডা লেগেচে! বেড়াতে যাবে কেমন একা-একা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব, আমাদের দলে তেমন ভিড়বে না,··· নিজের মনে থাকবে—ঐ তো দোষ !···

অনিশ কহিল—যদি জ্বর তেমন দেখেন, একটা খপর দেবেন,—হর-সুখকে আমি পাঠিয়ে দেবো'খন হাসপাতালে ডাক্তার আনবার জন্য।

কান্তি কহিলেন—বোধ হয় দরকার হবে না। গিয়ে এক-ডোজ্ এ্যাকোনাইট্ দেবো, ভাবচি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হাতে হাতে

মনটা সারাদিন ধরিয়া কি মায়া-জাল রচনায় যে প্রবৃত্ত হইল! পাঁচটা কাজে অনিশ যতই তাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চায়, ততই সে বাধন কাটিয়া পলাইয়া আসে। টহলপ্রসাদের কাছে কাছারিতে সেই সম্বন্ধীবাবুটিও আসিয়া জুটিয়াছিলেন। টহলপ্রসাদের কি পীড়াপীড়ি! অনিশ কহিল, বিবাহে তার আদৌ ইচ্ছা নাই। সামান্য আয়···কোনমতে তার দিন কাটে। তার উপর এত-বড় একটা ভার ঘাড়ে লইয়া কি ভরা-ডুবি হইবে! টহলপ্রসাদ বুঝাইলেন, অল্প দিনে অনিশের পশার যা হইয়াছে, তা বেশ আশাপ্রদ! ঘাড়ে দায় চাপিলে কাজেও তার চাড় বাড়িবে ঢের! অনিশ জবাব দিল, যদি কোনোদিন সে-দায়িত্ব বহিবার শক্তি মিলিবে বলিয়া তার বিশ্বাস জন্মায়, তবেই শুধু···ইত্যাদি।

এ কথায় সম্বন্ধীবাবু ঈষৎ ভড়কাইয়া হাল ছাড়িয়া কাছারি ত্যাগ করিলেন। তবু জানাইয়া গেলেন, পাশের বাংলার সেই বাবুটি আসিয়া কাল মেয়ে দেখিবেন বলিয়াছেন তো—দেখা যাক, তাঁর পছন্দ হইলে তখন তিনি একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন ইত্যাদি।

বৈকালে কাছারি ভাঙ্গিলে অনিশ কাছারির পোষাকেই একেবারে আসিয়া কান্তিবাবুর বাংলায় হানা দিল, ডাকিল,—কিষণ···

কিষণের পরিবর্ত্তে চিত্রা চৌধুরাণী আসিয়া দেখা দিলেন, কহিলেন—কাছারির পোষাকেই যে···! এখনো বাড়ী যান্‌নি?

অনিশ কহিল—না। কান্তিবাবুর কাছে ও-বেলায় শুনলুম, তাঁর ভগ্নীর নাকি জ্বর হয়েচে···মানে, ইনফ্লুয়েঞ্জা। একটা-দু'টো এধারে হচ্ছে কি না—তাই···

হাসিয়া চিত্রা কহিলেন—না, না। সামান্য জ্বর-ভাব। সে কিছু নয়। ভাত খেতে দিইনি, দু'খানা রুটী খাইয়েচি। এবেলা ভালোই আছে।

অনিশ কহিল—কান্তিবাবু নেই ?

চিত্রা কহিলেন—না। ক'খানা বাফতার থান দেখে শুনে কিনতে গেছেন—বাড়ীতে পাঠাতে হবে। তাই বেরিয়েচেন। তা আপনার জলযোগের ব্যবস্থা করি—বসুন। ওরে কিষণ···

অত্যন্ত অপ্রতিভের ভাবে অনিশ কহিল,—না, না। যাই। দয়া করে এতখানি প্রশ্রয় দেবেন না দিদি···কথাটা বলিয়াই চমকিয়া সে থামিয়া গেল।

চিত্রা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন—ঐ 'দিদি' সম্বোধনটুকু। করিয়া তিনি খুশী হইলেন। নারীর প্রাণ···প্রতি নিমেষ সে একটা সম্পর্কের বাঁধন খুঁজিয়া ফিরে। হাসিয়া চিত্রা কহিলেন—বেশ ভাই, আমি খুব খুশী হয়েচি তোমার ঐ দিদি ডাকটুকু শুনে। এত মিষ্টি লাগলো ! আজ থেকে আমি তোমার দিদি হলুম,—কেমন ?

অনিশ হাসিল, হাসিয়া কহিল—নিঃসঙ্গ থাকি, একা, বনবাসে··· স্নেহের এ সমুদ্র দেখে স্নেহাতুর মন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে ফেলেচে···

চিত্রা কহিলেন—এমনি স্পর্দ্ধা তার জন্ম-জন্ম প্রকাশ পাক্ !···

অনিশ হাসিয়া কহিল,—বেশ, তাই যদি তো আমি ছোট ভাই, আমাকে 'আপনি' বলে ও স্নেহের অপমান করবেন না তাহলে !

চিত্রা কহিলেন—তাই হবে। তাহলে দিদির মান্য রেখে জল-যোগটুকু··

অনিশ কহিল—এ আমার পরম সৌভাগ্য, দিদি! আমি এ লক্ষ্মীছাড়া পোষাকটা তাহলে ছেড়ে আসি। এটা অঙ্গে থাকলে মনে হয় যেন একরাশ খোট্টা মক্কেল ঘাড়ে চেপে বসে আছে!…

হাসিয়া চিত্রা কহিলেন,—বেশ, তাহলে মুখ-হাত ধুয়ে এখনি এসো। আমি চায়ের জল চড়িয়ে দি। তার পর উনি এলে একসঙ্গে সব বেড়াতে বেরুবো।

—বেশ! বলিয়া আনন্দোদ্বেল চিত্তে অনিশ নিজের বাংলায় ছুটিল।…

হরসুখদাস সেখানে ইতিমধ্যে আসিয়া হাজির হইয়াছে। বাবুকে দেখিয়া হরসুখ কহিল—ঠিক সন্ধ্যার সময় নেহালচাঁদবাবু আসবেন। জরুরি কাজ।

নেহালচাঁদের নাম শুধু ভাগলপুরে নয়, বেহার অঞ্চলে সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁর মস্ত কারবার। মুহুরি কহিল, সে-কারবারে ভারী গোলযোগ বাধিয়াছে। নেহালচাঁদের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ধরমচাঁদ কারবারে শুধু বখরাদার ছিল; তিন মাস পূর্ব্বে সে মারা গিয়াছে। তার এক পোষ্যপুত্র আছে, নাকালরাম। সেই নাকালরাম আর ধরমচাঁদের বিধবা পত্নী ধরমচাঁদের অংশ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইয়াছে এবং এক নালিশ জুড়িয়া দিয়াছে—তাহাতে রিশিভার নিয়োগের অবধি প্রার্থনা আদালতে জানাইয়াছে। সেই ব্যাপারেই নেহালচাঁদবাবু…

অন্য সময় হইলে অনিশ মুখ-হাত ধুইয়া সন্ধ্যা সাতটার প্রতীক্ষায় ব্যস্ত অধীর হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ এখন?…মন এখন স্নেহ-দরদের আশায় এমন অধীর যে পশার, পয়সা, মক্কেল—সে মনে এতটুকু পাত্তা পায় না!…তবু…

অনিশ কহিল—বেশ। এখন একবার ও-বাড়ীতে যাবো। সাতটায়

ফিরবো,—যদি একটু দেরী হয়, তাহলে খাতির করে তাঁকে বসিয়ে রেখো।...

হরসুখ কহিল,—টহলপ্রসাদবাবু এ-মামলায় থাকবেন, কিন্তু দিন দশেকের জন্য তিনি আরায় যাচ্ছেন। তাই নেহালচাঁদ বাবুকে বরাবর আপনার কাছে আসতে তিনিই বলে দেছেন।...

অত কথা অনিশের কাণে গেল না। মুখ-হাত ধুইয়া অনিশ তখনি কান্তি বাবুর বাংলায় ছুটিল।

চিত্রা কহিলেন,—একটু বসো। আমি আসচি।

কান্তিলাল তখনো ফেরেন নাই। অনিশ চুপ করিয়া বাহিরের হলে সেই বেঞ্চে বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে চিত্রা দেবী ফিরিলেন,—পিছনে লাজু। লাজুর হাতে টোষ্ট-রুটী, ডিম্, ফল ও মিষ্টান্ন। অনিশ হাসিয়া কহিল—এ তো জলযোগ নয় দিদি, এ যে রীতিমত গোলযোগের ব্যাপার। তা এত ব্যস্ত কেন? কান্তিবাবু ফিরে আসুন...

চিত্রা কহিলেন—তাঁর যদি আসতে দেরী হয় তো আমরা অপেক্ষা করবো না। বেড়ানো বন্ধ থাকতে পারে না। কিষণকে বরং বলে যাবো, কোন্ দিকে যাচ্ছি। উনি এলে পারেন, যাবেন...

অনিশ কহিল—উনি একলাটি কোথায় আমাদের খুঁজে বেড়াবেন?

চিত্রা কহিলেন—তাহলে আর বেড়ানো হয় না। সহরের বাইরে বাড়ী নেওয়া হলো কেন? বেড়াবার সুবিধার জন্যই তো! এই যা বেড়াই, এ শুধু হাওয়া খাওয়া নয়, এই সঙ্গে যেন রেডিয়ো মল্ট কিম্বা স্কট্‌স্ ইমলসনও খাওয়া হচ্ছে। তাছাড়া লাজুর কাল শরীর খারাপ গেছে...সন্ধ্যার পর বেশীক্ষণ বাইরে থাকবো না...

ইঁহাদের রক্ষী হইয়া সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাওয়া...এতখানি

বিশ্বাস! আনন্দে গর্ব্বে অনিশের বুক ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—আজ চলুন, ঐ লালকুঠির পাশ দিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ধার ঘেঁসে তিলাকুঠির নীচে একেবারে গঙ্গার ধারে যাওয়া যাক।

—বেশ! তুমি তাহলে একটা কাগজে পথ ছকে দাও। সেটা কিষণের কাছে রেখে যাবো। আর উনি এর মধ্যে যদি এসে পড়েন, ভালোই। বলিয়া চিত্রা লাজুর পানে চাহিলেন, কহিলেন—যা না দিদি, চায়ের পেয়ালাটা অমনি এনে দে। তার পর তোর সাজগোজ হয়েচে তো, তুই অতিথিকে একটু ভাখ্, আমি ততক্ষণে চট্ করে তৈরী হয়ে নি।...

এ কথায় অনিশ একবার চিত্রার সঙ্গিনীর পানে চাহিল। তার মুখে ঈষৎ ঘোমটা—মুখ দেখা যায় না! অনিশ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নহিলে মনের মধ্যে নানা উদ্ভট বাসনার জঞ্জালের তলায় যে-যৌবন অতি অযত্নে অনাদরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হয়তো সে জাগিয়া উঠিয়া তাকে একান্ত বেকুব বানাইয়া তুলিত!

লাজু চা আনিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল; চিত্রা বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্ম ছুটী লইলেন এবং অনিশ নানা চিন্তার গহনে মনকে ছাড়িয়া নিঃশব্দে সমস্ত প্লেটগুলি প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।...

পনেরো মিনিট পরে চিত্রা আসিয়া দেখা দিলেন। কান্তিলালের তখনো কোনো পাত্তা নাই। চিত্রা কহিলেন,—এই নিন কাগজ আর পেন্সিল। আপনি একটু লিখে রাখুন। লাজু, তোমার সেই মাফ্‌লারটা দিদি, গলায় জড়িয়ে নেবে...আর কিষণকে ডেকে দিয়ো...

এদিককার উদ্যোগ সারিয়া তিনজনে বাহির হইয়া পড়িল।...

পথে ধূলার অন্ত নাই। চিত্রা কহিলেন—উঃ, এ কি রাস্তায় আনলে, অনিশ...!

হাসিয়া অনিশ কহিল—ভাগলপুরে এসে ধূলোকে ভয় করলে তো চলবে না। এমন ধুলো বোধ হয় দুনিয়ার আর কোনো মুল্লুকে নেই।

—তাই দেখচি !...

পথের দু'পাশে শ্যামল তৃণ-গুল্মে ভরা বাগান, মাঠ,...তিলাকুঠিও দেখা দিল। অনিশ কহিল—একদিন কান্তিবাবুকে নিয়ে বেলাবেলি বেরিয়ে পড়তে হবে। ওই তিলাকুঠি দেখাবো'খন।...

তিলাকুঠির পাশ দিয়া আসিয়া গঙ্গার ঘাট। সামনে নদীর ধূ-ধূ বারিরাশি ...সায়াহ্নের সূর্য্য নদীর জলে যেন আবীর গুলিয়া দিয়াছে !...

চিত্রা কহিলেন—খাশা দেখতে হয়েচে !...

অনিশ কহিল—কান্তিবাবু এখনো এলেন না...এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

চিত্রা কহিলেন—আসবেন নিশ্চয়। বেড়াবার লোভ তাঁর কারো চেয়ে কম নয়।

অনিশ কহিল—উঠে একটু দেখি। এ জায়গা খুঁজে নিতে পারবেন তো ?...আমি কাগজে ছকে দিয়ে এসেচি ম্যাপ...এই ঘাটের কথাই লিখেচি।

চিত্রা কহিলেন—আসবেন নিশ্চয়। কোনো চিন্তার দরকার নেই।... ততক্ষণ তুমি একটা গান গাও...

অনিশ সলজ্জভাবে একবার গঙ্গার দিকে চাহিল,...তার পর আনমনা লজ্জাবতীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। মুখের ঘোমটা ঈষৎ সরাইয়া লজ্জাবতী গঙ্গার দিকে চাহিয়া ছিল। তার কর্ণমূলে সূর্য্যের ঐ রক্ত আভাটুকু...যেন চুনীর দুল ! অনিশ ভাবিল, অমন মেয়ে...উহার মাথার দোষ ?...বেশ তো পথ হাঁটিয়া আসিলেন ! ঐ তো কেমন বসিয়া আছেন ! তবে ? বাহির হইতে একটুও বুঝা যায় না, মাথায় অমন রোগ !

চিত্রা কহিলেন—গান হবে না আজ ?···কি রে লাজু, গান শুনবি ?

লজ্জাবতী মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া মুখ নামাইল।···চিত্রা কহিলেন—দেখলে ! মেয়ের এ যে কি বিষম লজ্জা ! কে এখানে আছে, বলো তো !···সত্যি ভাই, এমন ভাবনা হয় ওর জন্য···

জোর করিয়া কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া অনিশ কহিল—কিসের ভাবনা, দিদি ?

চিত্রা কহিলেন—বিয়ের। বাঙালীর ঘরে মেয়ে-জন্ম নেছে·· বিয়ে ছাড়া যে গতি নেই !

অনিশ কহিল—বিয়ের চেষ্টা আপনারা করেচেন কখনো ?

চিত্রা কহিলেন—করা হয়েচে বৈ কি ! তা বিয়ের নামে ভয়ে ওর মুখের কথা যেন লোপ পায় ! চোখও এমন ভেরে আসে যে কারো পানে তাকাতে পারে না—আমাদের কাছে অবধি নয় !···

অনিশ কহিল—ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?

—ঢের।

—তাঁরা কি বললেন ?

—ও এক-রকম রোগ···মস্ত বড় কি ইংরিজি, না ফরাসী নাম বললেন।

—সারবার উপায় ?

—বলেন, লোকজনের সঙ্গে খুব মেলা-মেশা করানো দরকার। বিশেষ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাঁরা গল্পস্বল্প করতে দিতে বলেন—তবে যদি এ লজ্জা ভাঙ্গে ! যদি মানুষের মত হয় ! চাই কি···

লজ্জাবতীর পানে সন্তর্পণে চাহিয়া কণ্ঠের স্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া চিত্রা কহিলেন—মনের ওর বাড় হচ্ছে না। এমনি গল্পে-স্বল্পে কাকেও দৈবাৎ যদি···

অনিশের বুকে যেন চাবুকের ঘা পড়িল! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তার চিন্তাকে সে ঐ ধূ ধূ বারি-বিস্তারের বুকে ভাসাইয়া দিল।

চিত্রা কহিলেন—ডাগর হয়েচে,—যার-তার সঙ্গে মিশতে দিতেও পারি না, কি হতে কি হবে শেষে! মেয়েমানুষের জ্বালার যে অন্ত নেই, ভাই। কি-দায়েই যে সে মরে আছে!

জল ছাড়িয়া চিন্তাগুলা অনিশের বুকের উপর ফিরিয়া অজস্র ছবি আঁকিতে সুরু করিল।...ছবির পর ছবি...তার পর সে ছবি আবার তাদের জটিল রেখা ছিঁড়িয়া ভাষায় রূপ ধরিতে লাগিল...রূপ ধরিয়া প্রকাণ্ড আকারে সীমা ছাপাইয়া বাড়িয়া চলিল।

চিত্রার স্বরে চিন্তার সে ছবি, সুর, ভাষা কোথায় সরিয়া গেল। চিত্রা বলিলেন,—গানটা ওর মনের পক্ষে বড় উপকারী। সেইজন্যই তোমায় আরো গাইতে বলি। তবে গানগুলি তরুণ বয়সের উপযোগী হওয়া চাই! রবিবাবুর গানের যত স্বরলিপি কিনে বাড়ীতে ডাঁই করেচি সেজন্য...

এ কথার পর সঙ্কোচ চলে না! অনিশ কোনমতে রুদ্ধ স্বরকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইল—দু'তিনবার কাশিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আবার বসিয়া সে গান ধরিল,—রবিবাবুর গান।

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছো মিলায়ে পবনে পবনে...

গাহিতে গাহিতে লজ্জাবতীর পানে চকিত দৃষ্টিও তার অজ্ঞাতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। অনিশের মনে হইতেছিল, ওই লজ্জানত মুখ গানের সুরে ক্রমে যেন তার স্বাভাবিক আসনে ঠিক বসিতেছে! মুখের ঘোমটাও তার অজ্ঞাতে ঐ একটু একটু উঠিতেছে...

গান থামিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কান্তিলালের কণ্ঠ-স্বর,—আচ্ছা নিভৃত স্থান বেছে নিয়েচেন মশায়···এ উত্তম !···আমায় ফেলে···আমি মহা চিন্তিত হয়ে উঠেছিলুম। ভাবলুম, আমার গৃহিণী বুঝি পলাতকা হয়েচেন,—ছুটে উকিলের বাসায় গেলুম পরামর্শের জন্য। গিয়ে দেখি, উকিলবাবুও পলাতক, গৃহে নেই! ভাবনা আরো বাড়লো। একে উকিল, তায় কবি, আবার তার উপর বিরহী—এই ত্র্যহস্পর্শযোগ আমায় একেবারে গল্প-সাহিত্যের কেন্দ্রে টেনে নিয়ে ফেললে··· Elopement নয় তো? দুঃখে আত্মহত্যা করবো বলে বাসায় ফিরলুম, এমন সময় প্রিয়-ভৃত্য কিষণচাঁদ এই কাগজখণ্ড দিলে। প্রাণ বাঁচলো, মন শান্ত হলো—তখন চা আর লুচি নিমেষে নিঃশেষ করে এই তেপান্তরের মাঠে এসে উদয় হলুম।

গম্ভীর দৃষ্টিতে চিত্রা কান্তিলালের পানে চাহিলেন, কহিলেন—কি বললে?···

কান্তিবাবু কহিলেন—মনের যাতনায় কিছু বে-ফাঁশই যদি বলে থাকি প্রিয়া, তার জন্য প্রলয়-ভ্রূকুটি-লীলা নয় ক্ষান্ত রাখলে! রেখে গতস্য শোচনা নাস্তি ভেবে সেটা নাহয় ক্ষমাও করলে!

চিত্রা কহিলেন—আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, ও-রকম ইতর তামাসা আর যেন কখনো না শুনি! রসিকতা আর ইতরমি—দুটোয় আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, এ কথা মনে রেখো!

কান্তিলাল কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন,—তাই হবে, দেবি! ক্ষন্তব্যোঽয়মপরাধঃ! ··তা, গান থামলো কেন? চলুক। আমি কি এমন অপরাধ করেচি যে ··

চিত্রা কহিলেন—লাজু, তুই একটা গান গা' না দিদি···

লজ্জাবতী আবার লজ্জায় জড়োসড়ো হইল। অনিশের প্রাণ বেদনায়

ভরিয়া উঠিল। অমন মোহিনী প্রতিমা···এ কি লজ্জার কঠিন পাষাণ-কারায় নিজেকে বন্দিনী রাখিয়াছেন! ঐ পাষাণের অন্তরালে হাসি-আলোর কি অজস্রতা ··কল্পনা সে-অজস্রতার চিন্তায় পাগল, মাতোয়ারা হইয়া ওঠে!···

হাসিয়া কান্তিলাল কহিলেন,—রবিবাবু বলেছেন,—

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়
মরি এ কি তোর দুস্তর লজ্জা!
সুন্দর এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা!

এইটিই নয় গাও, লাজু···লক্ষ্মী দিদি আমার···

লক্ষ্মী-দিদির কণ্ঠে গান তবু ফুটিল না। তখন গল্প সুরু হইল। বাফ্তার থান হইতে সুরু করিয়া ঢাকার মশলিন এবং হালের খদ্দর অবলম্বনে সন্ধ্যার আলোচনা নিবিড় জমিয়া উঠিল।···

চিত্রা কহিলেন—মনের মধ্যে খাঁটি ইংরেজকে বসিয়ে রেখে খদ্দরে শরীর মুড়ে তো ভারত-মাতাকে ড্যাঙডেঙিয়ে সব পুষ্পক-রথে চাপাবে তোমরা! আগে অন্তর-শুদ্ধি করো গো। শুধু খদ্দরে কিছু হবে না,—গায়ে ছড় সার হবে।

কান্তিলাল কহিলেন—তাই লাভ।

চিত্রা কহিলেন—আমি মানি না।

কান্তিলাল কহিলেন—বিলাস-ভূষণে অপব্যয় হয় কি সামান্য?

চিত্রা কহিলেন—অপব্যয়, মানি। তা বলে দিবারাত্র ধামার উপর বসে কুলোর ইতিবৃত্ত লিখলেও চলবে না। তোমার চিত্র, কাব্য,—এ-সবগুলো যেমন বিলাস নয়; গহনা, রেশমী শাড়ী—এগুলোও তেমনি সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে!···

অনিশ গোড়ার দিকে এ আলোচনায় যোগ দিলেও মধ্যপথে থামিয়া পড়িয়াছিল। কি হইবে এ মিছা তর্কে! ভারত-মাতার কথা তার মনে উদয় হয় না। তার এই নিঃসঙ্গ জীবনে, কেবলি হাহাকার! যে মনে শান্তি নাই, সে মন কি করিবে? তবে মাঝে মাঝে লজ্জাবতীর চারিধারে তার মন আলাপের উদগ্র বাসনায় ঘুরিতেছিল! সে দেখিল, বেচারী আড়ষ্টভাবে বসিয়া আছে, সারাক্ষণ! নিজের উপর রাগ ধরিল,—সে বাহিরের লোক আছে বলিয়াই বেচারীর হয়তো আরো লজ্জা! সে না থাকিলে তবু দু-একটা গল্প করিয়া, গান গাহিয়া আরাম পাইতেন! তাই হোক···

সহসা তার মনে পড়িল, নেহালচাঁদবাবুর কথা! অনিশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—আজ উঠলে হয় না? অন্ধকার হয়ে গেছে।

—আপনার মক্কেলবাবু আসবেন, বুঝি?

—তা নয় ঠিক। তবে অন্ধকার তো। পথও ভালো নয়।

কান্তিলাল কহিলেন—তা বটে।

সকলে উঠিল। মাঠের পথ—আল, ঢ্যালা···পায়ের বেশ কশরৎ হয়! কান্তিলাল চিত্রাকে কহিলেন—আমার হাত ধরো···কষ্ট একটু কমবে!

চিত্রা কহিলেন—তার চেয়ে তুমি লাজুর হাত ধরো।

কান্তিলাল কহিলেন—আর অনিশবাবু তোমার পাণি গ্রহণ করবেন······? মনের সে অভিপ্রায়টুকু খুলেই বলো না!

ভৎর্সনার সুরে চিত্রা কহিলেন,—আবার!

কান্তিলাল কহিলেন—আবার কি? কিন্তু আইনে বাধে। কোনো আইনই নারীর ডবল পাণি-গ্রহণ মঞ্জুর করে না। প্রথমতঃ পাণিপাঁড়ে সশরীরে যতক্ষণ বর্ত্তমান আছে, ততক্ষণ অন্ততঃ

চিত্রা কহিলেন—আর পুরুষের বেলায় পাণির বন্যা একেবারে, না ?

কান্তিলাল কহিলেন,—হিন্দু বলেই এ উদারতার বহর। সাধে বলি, জন্ম-জন্ম যেন হিন্দুর ঘরে পুরুষ হয়ে জন্ম নিই।

পায়ে হুঁচট লাগিয়া চিত্রা পড়িয়া যাইতেছিলেন, কান্তিলাল ধরিয়া ফেলিলেন ; কহিলেন—আর একটু হলেই তো পদস্খলন হয়েছিল ! দয়া করো গো, হাত ধরো। কোন্ স্বামী স্ত্রীর পদস্খলন সহ্য করতে পারে, বলো তো ?

চিত্রা কহিলেন—তোমার অভদ্রতা কখনো ঘুচবে না ! আমার সংসর্গ পেয়েও যখন কিছু হলো না…

কান্তিলাল কহিলেন—তখন দ্বিতীয় সংসর্গের চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য ! ওই ওদিকে বেচারী লাজু—আঃ, পড়েছিল আর একটু হলে। তাই বলছিনু, তুমি আমার হাত ধরো। আর লাজু—তা আইবুড়ো মেয়ে, অনিশবাবুর ভগ্নীর মত। না হয় অনিশবাবুর হাত ধরেই…harmless ভাই,—যেহেতু অনিশবাবু বিবাহিত—কোনো রকম ছোঁয়াচের আশঙ্কা নেই…

চিত্রা কহিলেন—হয়েচে ! লজ্জায় লাজু ঐখানেই মুখ গুঁজড়ে পড়বে তাহলে…

কান্তিলাল কহিলেন—অনিশবাবু, এই মাঠের পথটুকু লজ্জা ত্যাগ করে আমার লজ্জাবতী ভগ্নীর হাত দু'টি ধরে পার করে দিন তো। ঠিক কথাই বলেছিলেন আপনি—এ অন্ধকার নিবিড় হবার আগেই আমাদের এ স্থান ত্যাগ করা উচিত ছিল। এ জায়গা আঁধারের কীটাণুদের জন্য নয়। এ হলো জ্যোৎস্না-রাতের অভিসার-কুঞ্জ ! নদীর স্রোতে ঐ জ্যোৎস্নার সাঁতার—আঃ, খাশা ! আর একদিন তখন আসা যাবে।

কান্তিবাবু তখন জোর করিয়া লাজুর হাত অনিশের হাতে গুঁজিয়া

দিয়া কহিলেন,—লজ্জা যতই তুমি ভালো বাসো দিদি,...লজ্জার দায়ে তোমার হাত-পা তা বলে ভাঙ্গতে দেবো না...

অগত্যা!—অনিশের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল। শিরায়-শিরায় বিদ্যুতের প্রবাহ! লজ্জাবতীর হাত ধরিয়া যতটুকু চলিল, সে যেন নিশ্চেতন্! যেন কোন্ স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছে!...পথে আসিয়া লজ্জাবতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাস আরামের, না, বুকের ধূমায়িত দারুণ দাহের অবশেষ, তা শুধু তার অন্তর্যামীই জানেন!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুরের রেশ

বাড়ী পৌঁছিয়া কান্তিলাল কহিলেন—একটু বসবেন না, অনিশ বাবু?

অনিশ কহিল—না, একটু কাজ আছে।

কাজ থাকিলেও তার মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছিল! চৈত্রের ঝড়। সেই হাতের পরশটুকু! মনে পড়িল, সেকালে কোথায় বালু-তটে অজন্তা মন্দিরের চুম্বক-পাথর সমুদ্রের বড় বড় জাহাজকে না কি আকর্ষণের বিপুল বলে অচল করিয়া তুলিত! এ'ও যেন তাই! ঐ পরশটুকু তার সকল চিন্তা, সকল কল্পনাকে দিগন্ত-প্রসারী অসীমের ধার হইতে টানিয়া একেবারে ঐ তরুণীর সামনে আনিয়া তেমনি অচল করিয়া দিয়াছে, তার আর উধাও হইয়া কোনো দিকে ছুটিবার সামর্থ্য নাই!···

গৃহে হরসুখ বসিয়া ছিল; অনিশকে দেখিয়া উঠিল, কহিল, নেহাল-চাঁদ বাবু আজ আসিতে পারেন নাই। খবর পাঠাইয়াছেন, কাল সকালে তিনি আসিবেন।···

বাঁচা গেল! মনের এ অবস্থায় কোনো কোলাহল ভালো লাগে না! অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া ব্যাপারটাকে আগাগোড়া সে মনের উপর বিছাইয়া ধরিল।

লজ্জাবতী! ঐ লজ্জাটুকু তার চারিদিকে কি কৌতূহলই না রচিয়া রাখিয়াছে! অজানা মনের কি বিচিত্র রহস্য! মুখখানি অনিশ দেখে

নাই···না জানি, ও-মুখে মনের রহস্য-ছায়ায় কি অপরূপ শ্রীই না বিচ্ছুরিত আছে! বড় কোমল প্রাণটুকু!

পাচক আসিয়া জানাইল, খানা তৈয়ার। অনিশ কহিল—খাবো না।

কিছু ভালো লাগে না! জগতের যা-কিছু স্থূল কাজ···সব তিক্ত, বিরস, কদর্য্য! মনে হইল, এই যে মন-বস্তুটি বিধাতা মানুষের বুকে পুরিয়া দিয়াছেন, এ কত বড় অমূল্য সামগ্রী! দেহের ভোগ-বিলাসের নেশায় মানুষ কি বলিয়া ক্ষেপিয়া ওঠে! মনের বিলাস-বাসনা, তার যেমন সীমা-পরিসীমা নাই, তেমনি কি সহজেই না তার পরিতৃপ্তি ঘটে!···

এমনি নানা চিন্তা মনে উদয় হইল—কিন্তু সব চিন্তাই আসিয়া শেষ হয় ঐ লজ্জাবতীর মূর্ত্তির কাছে। লজ্জাবতী! লজ্জাবতী! এই না-দেখা, না-জানা কিশোরী কি মোহে যে তাকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। মেয়েটির এখনো বিবাহ হয় নাই! অনিশ একবার তার প্রাণের বাসনাটুকু কান্তিবাবুর কাছে নিবেদন করিবে কি? যদি রাজী না হন্? তার ইতিহাস সে খুলিয়া বলিয়াছে, কোথাও কোনো গোপনতা রাখে নাই,—সে-সব ঘটনা জানিয়া তিনি রাজী হইবেন?···তার চেয়ে এই মানসী কল্পনা—এ-কল্পনা মনে অনেকখানি আরাম আর সান্ত্বনা গড়িয়া তোলে!

সহসা বাহিরে কান্তিবাবুর স্বর,—অনিশবাবু ঘুমিয়েচেন না কি?

অনিশ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কহিল—না, আসুন।

কান্তিবাবু ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—বড় অন্ধকার দেখচি। আলো জ্বালেন নি যে···

অনিশ কহিল—মাথাটা একটু ধরেচে। বলিয়া সে আলো জ্বালিল।

—ঠাণ্ডা লাগলো না কি ?

—না।

কান্তি কহিলেন,—দেখুন, আমি আজ অনেক ভেবেচি আপনার কথা। লাজুর জন্য আমাদের ভাবনার অন্ত নেই। একটি সুপাত্র পেলে···তা, আপনার কাহিনীও শুনলুম। অবশ্য বড় শক্ত সমস্যা—আপনার মনের যে-পরিচয় পাচ্ছি, তাতে আমার বিশ্বাস, লাজু আপনাকে সুখী করতে পারবে এবং আপনার দরদে লাজুও সুখে থাকবে।

অনিশের গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল—আনন্দের উত্তেজনায়! এ সে কি কথা শুনিতেছে ?···

কান্তিবাবু কহিলেন—কিন্তু ভাবচি, আর-একজনকে স্থানচ্যুত করে সে জায়গায় লাজুকে বসিয়ে দেওয়া···এ খুব অন্যায় কাজ হবে না কি ?··· অবশ্য এর পর যদি সে স্ত্রী এসে আপনার শরণ নেন, তাঁকে আপনি নেবেন,—নিশ্চয় নেবেন। না নেওয়া অকর্ত্তব্য···তবে তাঁর একচ্ছত্র অধিকারের মধ্যে আর-একজনকে ভাগীদার করে ছেড়ে দেওয়া—এটা দু'জনের দিক দিয়েই হয়তো সঙ্গত হবে না—এইটেই হলো মস্ত সমস্যা!

তা ঠিক! এ সমস্যার সমাধানের কি উপায় আছে, সে কথাও অনিশ অনেকবার ভাবিয়াছে···কিন্তু ভাবিয়া তাহার কোন সমাধান করিতে পারে নাই। ··তবু আজ এতখানি আশার বাণী যখন কাণে বাজিয়াছে···

সে একেবারে কান্তিবাবুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আপনি আমার এ অন্ধ নয়নে আলো জ্বেলে দিন দয়া করে। আমি তো বলেচি আপনাকে, কি দারুণ হতভাগা আমি ·!

কান্তিবাবু কহিলেন—সেই কথাই আমি ভাবচি। কেন জানি না,

আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে অবধি আপনার উপর এমন দরদ হয়েচে, এমন মমতা ··শুধু আমার নয়, আমার স্ত্রীও বলছিলেন,—আপনি তাঁকে দিদি বলে ডেকেছিলেন না কি আজ! তিনি এই খাবার সময় সে কথা আমায় বলছিলেন। বলছিলেন যে আপনার ঐ দিদি-ডাকটুকু একেবারে তাঁর অন্তরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচে···

অনিশ কহিল,—ও-সমস্যার সমাধানের কথা বলছিলেন না? সে স্ত্রী তুচ্ছ সংসার নিয়েই আরামে থাকবেন। আমার জন্য তাঁর দরদ কোন-দিনই জাগবে বলে মনে হয় না!···জাগলেও আমি বরাবর এইখানে থাকবো। আর আপনি যে প্রস্তাব করছিলেন তা যদি ঘটে, সত্যই,—তাহলে এটুকু নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার ভগ্নীকে ঠেলে···

কান্তিবাবু কহিলেন,—আহাহা, তা আমি বুঝি। শিক্ষিত মনের সঙ্গিনী হবার পক্ষে নারীর যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন, সে সব গুণ লাজুর আছে প্রচুর···তা, আপনি একবার তার সঙ্গে আলাপ করুন। সে সুযোগও আমি দেবো। যদি বোঝেন, তার মন···কোনো রকম লজ্জা করবেন না···

আবার আশার সুর সপ্তমে উঠিতেছে! আঃ! কিন্তু···আর এক সমস্যা! অনিশ কহিল—দিদি তো আমার পরিচয় জানেন না। তিনি কি এ ক্ষেত্রে···

উদ্বিগ্ন চিত্তে কান্তিবাবু কহিলেন,—সে এক সমস্যা। নারী যত স্নেহময়ীই হোন্, ওদিকটায় তাঁদের টনক্ আগে নড়ে। স্নেহের কূল ছাপিয়ে সে চিন্তা···আপনি ভাববেন না—এদিকে সুবিধামত progress দেখলে আমি তাঁকে রাজী করাতে পারবো, বোধ হয়···! তাঁকে আপনার পরিচয় প্রকাশ করে বলিনি এবং আপাততঃ না বলাই মঙ্গল!

অনিশ চুপ করিয়া রহিল। বুকের মধ্যে এমন দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ হইতেছিল · সেখানে যেন পাথর ভাঙ্গার কাজ চলিয়াছে! কান্তিও চুপ!···

সহসা রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া সুমধুর স্বর-লহরী···সুরের তরঙ্গ যেন! কান্তি চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—লাজু গান গাইচে!···

অনিশ কহিল—শুনতে হবে। বলিয়া বাড়ীর বাহিরের দিকে চাতালে গিয়া দাঁড়াইল। ও-বাড়ীতেই বটে! দিদির গলা নয় ··লাজুই তবে?

কান্তিবাবু কহিলেন,—লাজুই গাইচে।

লাজু গাহিতেছিল,—

বসন্ত আজ এলো আবার,
এলো এলো রে
সাজিয়ে ভুবন ফুলে!
মুকুলের এই জেগে চাওয়ায়
উতল হাওয়ায়
উঠলো এ বুক দুলে!
চাঁদ উঠেচে সেই বিমানে,
সেই পাখী গায় ফুল-বিতানে—
পথের ধূলি দেছে ঢেকে
সেই ঝরা বকুলে!
পাতায় পাতায় মর্ম্মরে ওই,
চমক লাগায় মনে!
জ্বালিয়ে বাতি নয়ন মেলি
বসি বাতায়নে!

"ফাগুন এলো, এলো ফিরে—
তোমায় তবু আঁখির তীরে
পাইনা কেন? হায়গো প্রিয়,
রইলে কোথায় ভুলে!

কান্তিলাল কহিলেন,—শুনচেন? গানের অর্থ বেশ আছে।

প্রাণ-মন একাগ্র করিয়া অনিশ গান শুনিতে লাগিল। গান থামিলে মনে হইল, যেন আকাশে-বাতাসে সুরের প্রচণ্ড দোল্ লাগিয়া গিয়াছে! পাতায়-পাতায় জাগে মৃদু মর্ম্মর-রব! কোন্ অজানা মায়াপুরীর বাতায়নে দীপ জ্বালিয়া কে ওই তরুণী কার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! কে গো, কে সে ভাগ্যবান?

কান্তি কহিলেন—আমি তাহলে চল্‌লুম।...কাল থেকে আমি সহায় আছি, আপনি লাজুর চিত্ত-জয়ের আয়োজন করুন!...

কান্তিবাবু চলিয়া গেলেন, আর অনিশ পাথরের মূর্ত্তির মত সেই চাতালে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মৌমাছির হুল

সকালে চায়ের কাপে সুতার বাড়িয়াছিল—অনিশ ২ পেয়ালা চা পান করিল। চিত্রা কহিলেন,—মাথা ধরা ছেড়েচে তো…?

—ছেড়েচে।…

বাংলা হইতে পাচক আসিয়া সংবাদ দিল,—মক্কেল নেহালচাঁদ বাবু…

কান্তিলাল কহিলেন—তাহলে ভাঙ্গুক মেলা, চায়ের খেলা বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী!

চিত্রা কহিলেন—তোমার উচিত ছিল কবি হওয়া…

কান্তিলাল কহিলেন—উচিত তো অনেক বস্তুই ছিল। কিন্তু যা উচিত, তাই কি ঘটে জগতে! আমার কবি হওয়া উচিত ছিল, তা বুঝেচি যে দিন তুমি এসে ভাবোন্মোদনায় আমার সুপ্ত চিত্ত জাগিয়ে তুলেচো! কিন্তু দেবী, ভাব প্রচুর দিলেও ছন্দ মেলাবার শক্তি তো দাওনি ··অমিলে-গরমিলে তোমার জীবন ভারাক্রান্ত করেচি, তুমি প্রিয়া বলেই তা সহ্য করেচো। জগতের সঙ্গে এমন মধুর সম্পর্ক নেই তো—জগৎ তা সহ্য করবে কেন?

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইবার উদ্দেশ্যে অনিশ আসিয়া যথারীতি দেখা দিল। ঘরের মধ্য হইতে কান্তিলাল কহিলেন—ঘরে আসুন…

ঘরে আসিয়া অনিশ দেখে, কান্তিবাবু বিছানায় শুইয়া, তক্তাপোষের

নীচে হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে—হারিকেনের পাশে বসিয়া লাজু··· লণ্ঠনের উপর ভাঁজ-করা একপ্রস্থ টুকরা ফ্লানেল; আর কান্তিলালের পাশে বসিয়া চিত্রা স্বামীর পায়ে শেঁক দিতেছেন।

অনিশ কহিল—ব্যাপার কি?

চিত্রা কহিলেন—রেল্-লাইনের ওপর গিয়ে উঠেছিলেন,—ফিরতে পড়ে গেছেন। পা নাড়তে পারচেন না। তাই···

অনিশ সোৎকণ্ঠে কহিল—ডাক্তার?

কান্তিবাবু কহিলেন—আঃ, এই তুচ্ছ ব্যাপারে ডাক্তার এনে পা-খানাকে একদম্ জখম্ করি আর কি! দু'দিন শেঁক-তাপেই এ ব্যথা যাবে। কাটেনি যখন···তা, শেঁক হলো তো···তোমরা এবার বেড়াতে যাও। অনিশবাবু এসেচেন···

অনিশ কহিল—বেড়ানো আজ না হয় থাক্!

কান্তি কহিলেন—না, না—ওঁরা দু'জনে যান্। ও কাজটায় শৈথিল্য ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়।

চিত্রা কহিলেন—আমি থাকি, লাজু বরং যাক্ অনিশের সঙ্গে। কাছেই একটু এ-ধারে ও-ধারে। ওর পক্ষে বেড়ানোটা বেশ উপকার দিচ্ছে!···লাজু···

লাজু লজ্জায় মাথা নামাইল। কান্তি কহিলেন—না দিদি, কথা শোনো। আধ ঘণ্টাটাক নিদেন ঐ শাজঙ্গীর দিকেই নয় যাও···সন্ধ্যা হলেই ফিরো···একটু বেড়াওগে···কথা শোনো দিদি। নাহলে আমি শেঁক বন্ধ করবো।

লাজুকে উঠিতে হইল। অনিশ কহিল—ওঁর লজ্জা হচ্ছে।··· আপনারা কেউ সঙ্গে থাকবেন না···মুখ বন্ধ করে···

চিত্রা কহিলেন—কবে আর ও কথা কয়? কথা যদি ওকে কওয়াতে

পারো অনিশ, তা হলে ওর মস্ত উপকারই করবে। ডাক্তারে বদ্দিতে তো এলে দেছে···ও যে কি কাঁটার মত বুকে ফুটে আছে !···বেচারী !···

অনিশ কহিল—কখন পড়লেন আপনি ?

কান্তি কহিলেন—এই ঘণ্টা খানেক আগে।

অনিশ কহিল—হঠাৎ ও খেয়াল হলো কেন ?

কান্তি কহিলেন—ওদিকটায় কি আছে আবিষ্কার করবো বলে গিয়েছিলুম। নিভৃত নিকুঞ্জ যদি মেলে···

চিত্রা হাসিয়া কহিলেন—বয়স হয়েচে, তবু তারুণ্যের উপদ্রব তো ঘুচলো না।

কান্তি কহিলেন—কি ! বয়স ? আমি মানি না·· আমি চির-তরুণ ! আমার আবার বয়স কি ! ওদিকে হুঁশ করিয়ে দিয়ো না গো। হুঁশ হলেই এক নিমেষে বাত, লাম্বাগো, গাউট সশস্ত্রে এসে হানা দেবে, আমি তাদের প্রতিরোধ করতে পারবো না ! বয়স হয়েচে—এ-জ্ঞান জন্মাবা-মাত্র সর্ব্বনাশ ঘটবে ! জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার মানে কি, জানো ? ঐ জরা-মৃত্যু ডেকে এনে দুর্দ্দশার সূত্রপাত করেছিলেন আমাদের আদিম পিতা-মাতা আদম আর হিভা !

—আঃ, এতও জানো, বাবু !···

লজ্জাবতী আসিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইল। কান্তি কহিলেন,—আপনার ward ready···যান্ নিয়ে···যেমন নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অক্ষত দেহ-মনে ফিরিয়ে আনবেন, মোদ্দা !

অনিশের পা কাঁপিতেছিল, সর্ব্ব-শরীর টলিতেছিল—ভয়ে, না, লজ্জায় ? কোন মতে সে কহিল—আসুন তাহলে। কথাটা বলিয়া সে কপালের ঘাম মুছিল—এই ব্যাপারেই সে ঘামিয়া একশা' হইয়াছিল !

অনিশ অগ্রসর হইল, লজ্জাবতী তার পিছনে। চিত্রা বাহিরের

চাতালে দাঁড়াইলেন, কহিলেন,—তেমন অন্ধকার হবার আগেই ফিরে এসো·· দুদণ্ড তখন ঘরে বসে গল্পস্বল্প করবো'খন। আমি ওঁর শেঁকটা ততক্ষণে সেরে ফেলি···

হাসি-মুখে চিত্রা ঘরে ফিরিলেন।...

অনিশকে অতি ধীরে পথ চলিতে হইল। নহিলে লজ্জাবতী কোথায় বহু দূরে পিছাইয়া থাকে!···গলায় ঘণ্টা-বাঁধা গোরুর পাল লইয়া গোয়ালার দল পথে চলিয়াছে। লজ্জাবতীর গতি কাজেই আরো কুণ্ঠিত হইতেছিল। অগত্যা পাশাপাশি যাওয়া ছাড়া উপায় রহিল না!...

এই পথ ··লজ্জাবতীর মুখে ঘোমটা তেমনি,—অনিশ ভাবিল, ঘোমটা ঘরে চলে, পথে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা প্রতিপদে ঘনাইয়া তোলে! অতএব

কথা বলিতে হইল। অনিশ কহিল,—অমন করে চললে পড়ে যাবেন···

কথায় কোনো ফল ফলিল না। লজ্জাবতীর লজ্জা তেমনি!

একটা গোরু পিছন হইতে তাড়া খাইয়া হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল, একেবারে পাশে···ভয় পাইয়া লজ্জাবতী আরো পাশে সরিয়া গেল—পাশেই মস্ত খানা। আর একটু হইলেই···অনিশ খপ্ করিয়া তার হাত ধরিয়া ফেলিল, কহিল,—আর একটু হলে পড়ে যেতেন··· দাঁড়ান। গোরুগুলো চলে গেলে পথ সাফ্ হয়ে যাবে। এখন পথের মাঝখান দিয়েই চলতে হবে!···

হাত ছাড়িয়া দিতে অনিশ কিন্তু ভুলিয়া গেল। তার মনের মধ্যে ভারী গোল বাধিয়াছিল।·গোরুগুলা চলিয়া গেলে অনিশ তখন কহিল—পথে আসুন···

লজ্জাবতী পথে আসিল—হাত কিন্তু তেমনি অনিশের হাতে!

টানিলেও অনিশ ছাড়িল না। বুঝি, ছাড়িয়া দিবার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল!

অবশেষে হাত টানিয়া লজ্জাবতী অতি-কষ্টে কহিল—হাত ছাড়ুন।

বড় কথা নয়। অনিশের সমস্ত প্রাণের মধ্য দিয়া যেন সাতটা সুর বিদ্যুতের মত বহিয়া গেল। লজ্জিত হইয়া সে লজ্জাবতীর হাত ছাড়িয়া দিল। তার পর সরল পথ, কাজেই ঘটিবার মত কিছু কিছু ছিল না।

ঐ শাজঙ্গী···মস্ত ঝিল। আমগাছের কালো ছায়া নিথর নিস্পন্দ। অনিশ কহিল—ওপরে উঠবেন, না, ঐ জলের কোলেই বসবেন?

কোনো জবাব না দিয়া লজ্জাবতী আসিয়া জলের কোলে বসিল। অনিশকে অগত্যা তার কাছে বসিতে হইল।

দূর হইতে বস্তীর ছেলেদের খেলার কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল—কোথায় দূরে কে বাঁশী বাজাইতেছে!···অনিশের সমস্ত অঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কান্তিবাবুর সেই কথা···আমি সুযোগ দেবো! এ তাই না কি? একবার তাহা হইলে···একটু চেষ্টা··· ক্ষতি কি!

সাধিয়া অনিশ কহিল—গান শুনবেন?

লজ্জাবতীর দিক হইতে কোনো সাড়া নাই, জবাব দূরের কথা। অনিশ ভাবিল, এই মৌন মূক পাষাণ প্রতিমার কাছে সে কিসের কামনা লইয়া আজ দাঁড়াইতে চায়! সে কি পাগল হইয়াছে?···

আবার সে প্রশ্ন করিল—গান গাইবো?···

লজ্জাবতী সুদূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বসিয়া ছিল—দ্বিতীয় প্রশ্নে মাথা নামাইল। অনিশ ভাবিল, কলের পুতুল! দু'টী মাত্র ভঙ্গী সে লক্ষ্য করিতেছে—একবার উদাসভাবে আকাশের পানে চাওয়া, পরক্ষণে

মুখখানি নামাইয়া লওয়া…! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, সাধনা ? তাই দেখি !…

তৃতীয় প্রশ্ন না তুলিয়া সে গান ধরিল,—

প্রভাত-লগনে জাগিল কমল
মেলিয়া কোমল আঁখি—
সুর-শতদলে ভরিল এ বুক
তারি সৌরভ মাখি !…

কাছেই বুঝি ওটা মহুয়া ফুলের গাছ ! মদির গন্ধে সন্ধ্যার হাওয়া মাতোয়ারা ! অনিশের কোলের কাছে একটা ঢিল আসিয়া পড়িল। অনিশ চমকিয়া গান থামাইল, পরে উঠিয়া চাহিয়া দেখে, দুটো ছোকরা দূর হইতে তেঁতুল গাছে ঢিল ছুড়িতেছে। অনিশ ধমক দিল। ধমক খাইয়া ছোকরারা ছুটিয়া পলাইল।

অনিশ ফিরিয়া আসিবে, এমন সময় তার হাতে কি ফুটিল—অসহ্য জ্বালা। হাত ঝাড়িয়া দেখে, একটা মৌমাছি…তার হাতে বেশ হুল ফুটাইয়াছে ! সে আসিয়া হাতে জল দিল।

জ্বালা তবু থামে না। হুলটা তখনো ফুটিয়া আছে !—অনিশ কহিল, —আপনার মাথায় কাঁটা আছে ? লোহার কাঁটা ? একটা দিন্ তো দয়া করে—মৌমাছিতে হুল ফুটিয়ে দেছে !

লজ্জাবতী লজ্জা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি মাথার খোঁপা হইতে একটা কাঁটা খুলিয়া দিল। ঘোমটা মুখের উপর হইতে সরিয়া গিয়াছিল, অনিশ তার পানে চাহিয়া দেখিল, চকিতে একখানি রমণীয় মুখ—

কাঁটা লইয়া হাতের আহত জায়গাটা অনিশ খোঁচাইয়া তুলিল, এই যে খচ খচ্ করিতেছে—কনুইয়ের কাছে। তার নখ তেমন বড় নয়, কাজেই—

লজ্জাবতীর পানে চাহিয়া অনিশ কহিল—একটু কষ্ট করে তুলে দেবেন? এই যে খচ্ খচ্ করচে।

লজ্জাবতী কনুই স্পর্শ করিল,—অনিশ নিঃসঙ্কোচে তার সেই চাঁপার কলি আঙুল ধরিয়া কনুইয়ের পাশে বুলাইয়া কহিল—এই খচখচ্ করচে—বুঝচেন?

ঘাড় নাড়িয়া লজ্জাবতী জানাইল, সে ঠাহর পাইয়াছে!

আঃ! অনিশের মনে হইল, তার সর্ব্বাঙ্গে মৌমাছির হুল ফুটুক অজস্র—এই সেবার পরশটুকু যদি···

খুঁটিয়া হুল উঠাইয়া দিয়া লজ্জাবতী প্রশ্ন করিল,—জ্বালা করচে?

খুব মৃদু স্বর—তবু সে-স্বরে কি কাতরতা! দরদের, মমতার কি মোহন-মধুর স্পর্শ!

অনিশ কহিল—খুব জ্বালা করচে।

লজ্জাবতী কহিল—তাহলে বাড়ী চলুন। বাড়ীতে ওষুধ আছে।

—না, থাক্!—আপনি একটু বসবেন না?

লজ্জাবতী সে কথার জবাব দিল না, একেবারে উঠিয়া দাড়াইল।

অনিশ সকাতরে কহিল—বসবেন না?

লজ্জাবতী জবাব দিল না। অনিশ কহিল—আপনি যদি কথা না কন্, তাহলে আমি যাবো না!

লজ্জাবতী কহিল,—আগে ওষুধ দেওয়া দরকার। স্বর তেমনি মৃদু, এবং সে স্বরে সেই কাতরতা!

অনিশ কহিল—বেশ, যাবো। দয়া করে একটা অনুরোধ শুধু—

লজ্জাবতী কহিল—বলুন···

তার মুখ আনত, এবং তেমনি ঘোমটায় ঢাকা !

অনিশ কহিল—কাল রাত্রে আপনার গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—সে লোভ এমন দুর্ব্বার ! যদি একটি গান এখন…

লজ্জাবতী লজ্জায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। অনিশ কহিল—করজোড়ে মিনতি করছি…

লজ্জাবতী চারিধারে চাহিল,—মুখের ঘোমটা সরিল না। তার পর সে কহিল—একটুখানি কিন্তু—

আনন্দে অনিশ কহিল—তাই হোক্।

লজ্জাবতী গাহিল,—

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করবো নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন !…

চাপা গলা—তবু কি আন্তরিকতা ফাটিয়া পড়িতেছে কথার স্থরে ! অনিশ মুগ্ধ হইল, বিভোর হইল, কিন্তু গান তখনি থামিল।

অনিশের চিত্ত হায়-হায় করিয়া উঠিল। চমকিয়া সে কহিল—এমন নিষ্ঠুর হয়ে গান থামিয়ে দিলেন !

লজ্জাবতী কহিল—চলুন। ওষুধ না দিলে হাতের যাতনা বাড়বে—উপসর্গও ঘট্‌তে পারে।

অনিশ কহিল—চলুন…

সেই পথ…চিন্তার অন্ধকারে যে পথ আচ্ছন্ন ছিল, ফিরিবার সময় সে পথে এখন কি আলো !

পথে অনিশ কথা কহিল, অনেক প্রশ্ন করিল,—আপনি কবিতা ভালোবাসেন্, না, গল্প ? মাসিক পত্র কোন্‌টা পড়তে ভালো লাগে ? কোন্ লেথক আপনার সব-চেয়ে প্রিয় ?…

অবশেষে আর-একটি প্রশ্ন,—আমার কোনো কবিতা পড়েচেন ?···

শেষ প্রশ্নের জবাব মিলিল। লজ্জাবতী কহিল—পড়েচি।

অনিশ কহিল—এখানে আসার আগে পড়েছিলেন ? না, পাশের বাড়ীতে থাকি, এই জন্যই···?

লজ্জাবতী কহিল—আগেই পড়েছিলুম।···

আঃ! কি আরাম! অনিশের মনে হইল, তার কবিতা লেখা সার্থক হইয়াছে!···

গৃহে ফিরিয়া লজ্জাবতী সহসা গতির বেগ দ্রুত করিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। অনিশ আসিয়া ডাকিল—দিদি···

কান্তিবাবু কহিলেন,—আসুন···

কান্তি বিছানায় বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন, কহিলেন—এর মধ্যেই ফিরলেন যে ?

অনিশ কহিল—একটা accident! আমার হাতে মৌমাছি কামড়ালো, উনি আর থাকতে চাইলেন না, বললেন, ওষুধ দেবেন, চলুন—

কান্তি কহিলেন—মুখের বচনে ?

—হাঁ। শুধু তাই নয়। বহু মিনতি জানিয়ে গানও শুনেচি—একটু। তা হোক্—অমৃত বেশী সয় না।

কান্তি সোল্লাসে কহিলেন—বাঃ! লজ্জাবতীকে কথা কওয়াতে পেরেচেন! ডাক্তাররা বলেচেন, অজানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা—তা, আপনি stick করে থাকুন—একাগ্র সাধনা চাই!

হাসিয়া অনিশ কহিল—আপনার অনুগ্রহ! যদি একটা জীর্ণ মন···

—থাক ও কথা। বাধা দিয়া কান্তি কহিলেন—গৃহিণীকে জোর করে বেড়াতে পাঠিয়েচি—কিষণ গেছে সঙ্গে! কিছুতে যাবেন না—শেষে গম্ভীর হয়ে উঠলুম, তখন—

অনিশ কহিল—আপনার মত সুখী লোক…

কান্তি কহিলেন—তা, এদিক দিয়ে কোনো দুঃখ, কোনো অভাবই নেই। আমার যে পত্নীস্থানে চন্দ্র—always pleasing and cheerful তাই, জ্যোৎস্না-ধারার মত!

দ্বারে এক নারী-মূর্ত্তি…তার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত! কান্তি কহিলেন,—কে? লাজু! হাতে ও কি, দিদি? ওঃ, ভিনিগারের বোতল। অনিশবাবুর হুলের ওষুধ—বটে! তা, ইনি তো নেই, তুমি ওঁর সেবার ভার নাও।

লজ্জাবতী ঘরে আসিল, আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনিশ জামার আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইল। কান্তি কহিলেন—ইস্, বেশ ফুলে উঠেচে যে!—তা দিয়ে দাও—এতে লজ্জা কি, দিদি? সেবার কাজ তো তোমাদেরই!

অনিশ বিছানায় বসিল, লজ্জাবতী অগত্যা হাতে ভিনিগার ঢালিয়া তার কনুইয়ে মালিশ করিতে লাগিল।

হাসিয়া কান্তি কহিলেন—সেবা দেখে আমার লোভ হচ্ছে,—কোথায় সেই বন, দেখিয়ে দেবেন তো অনিশবাবু, গোটাকতক হুল আমি তাহলে বুকে ফুটিয়ে আসবো…

একটা হাসির ঝাপ্‌টা—চট্ করিয়া থামিয়া গেল। কান্তি কহিলেন,—এই যে response পাচ্ছি। অনিশবাবু, ওকালতি ছেড়ে চিকিৎসা ধরুন। আমার দিদিকে যদি সারিয়ে দিতে পারেন তো যা চাইবেন, তাই দিয়ে আপনাকে খুশী করবো আমরা।

অনিশ লজ্জাবতীর পানে চাহিল, লজ্জাবতী ঘাড় কাৎ করিয়া নিজের স্কন্ধে মুখ ঢাকিল—মুখ তেমনি ঘোমটায় ঢাকা।

রাত্রে অনিশ বাড়ী ফিরিল, চোরের মত। কারণ, সেই মাথার কাঁটাটা তার পকেটেই ছিল—ফিরাইয়া দেয় নাই। পাছে তা ধরা পড়ে, পাছে সেটা কেহ ফেরৎ চায়—এই ভয়ে তার গা ছম্‌ছম্ করিতেছিল…সারাক্ষণ!—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মুখ ফুটিল

পরের দিন কান্তিবাবুর পায়ের ব্যথা বিন্দুমাত্র রহিল না। নেহালচাঁদের উৎপীড়নে ও-বাংলায় অনিশের সকালে চায়ের নিমন্ত্রণ-রক্ষা ঘটিল না। নেহালচাঁদের মত মক্কেল লক্ষ্মীর প্রসাদ—তবু সেদিকে অনিশের আজ আগ্রহ নাই। সেই মাথার কাঁটাটি বুকে করিয়া কালিকার রাত্রি কাটিয়াছে—আজ সকালেও সেই কাঁটাটির পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়াও তার দেখার সাধ আর মিটিতে চায় না—এমন সময় নেহালচাঁদের আক্রমণ!

কান্তিবাবুর ভৃত্য আসিয়া চায়ের কথা বলিল। অনিশ সেদিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল মাত্র—জবাব দিবার অবসর ছিল না—নেহালচাঁদ দশ বছরের খাতা খুলিয়া তখন হিসাব বুঝাইতেছে!—মাথায় সে অঙ্ক ঢুকিতেছে না, তবু হাঁ-না করিয়া মাথা নাড়িয়া সে সায় দিয়া চলিয়াছে।

অবশেষে কান্তিবাবুর প্রবেশ। কান্তিবাবু কহিলেন—এই যে! তা ভালো, ভালো। চা আমি এখানে আনতে বলে দিচ্ছি।—কান্তি উঠিলেন।

অনিশ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—চললেন?

কান্তি কহিলেন—না, এখন বিরক্ত করা উচিত নয়। 'এ সাধনা না করলে কোনো কাজে সিদ্ধি মেলে না। ওবেলায় দেখা হবে। তখন হৃদয়-সাধনা এই dual role-ই পুরুষের চাই। না হলে পুরুষ কাপুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।

কান্তি চলিয়া গেলেন। একটু পরে চা আসিল, সেই সঙ্গে হালুয়া, নিমকি। নেহালচাঁদের খাতার আড়ালে সেগুলার সদ্গতি করিয়া অনিশ ভাবিল, এ হিসাব চুকিবার নয়। সাধে মামলা করিয়াছে!··· কাছারিতে টহলপ্রসাদকে রিপোর্ট দিতে হইবে—একটা ইজ্জৎ! কিন্তু আর পারাও যায় না! এই পয়সার দাসত্ব···অসহ্য!

অবশেষে নেহালচাঁদ উঠিল, বলিল,—দশ বাজতা হ্যায় বাবু-সাব। ফিন্ সাম্‌কো···

প্রাণ চমকিয়া উঠিল। আবার সন্ধ্যায়? অনিশ কহিল—সন্ধ্যায় আমার একটা নিমন্ত্রণ আছে।

—তব্ রাতমে? আট বাজে···?

—না। কাল এমনি সময়েই···

—দেরী হোবে না···?

—না। সকালে মাথা সাফ্ থাকে, হিসাব দেখবার সুবিধা হবে।

—এ ঠিক বাত, বাবু-সাব। কাল তব ফিন্ সাত বাজে সবেরে। ফীজ বাবু-সাব আজ-কা কাম্-ওয়াস্তে।

নেহালচাঁদ দশ টাকার একখানি নোট দিল—দশ রূপেয়া রোজ দে'গা, বাবু-সাব। এ বহুৎ রোজকা কাম্···

তাকে তাড়াইতে পারিলে অনিশ বাঁচে। অনিশ কহিল—বহুৎ আচ্ছা!···

দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্নানাহার সারিয়া কাছারিতে বাহির হইবার সময় ব্যাকুল নেত্রে পাশের বাংলার পানে চাহিতে অনিশ দেখে, বাহিরে হলের থামে গা ঘেঁষিয়া কে দাঁড়াইয়া! দিদি?··· না, ও লজ্জাবতী! দিনের আলোয় সদ্যস্নাতা সুন্দরী কিশোরী···মুখের ঘোমটা খোলা···পথের ঐ অশথ গাছটার পানে চাহিয়া···কি দেখিতেছেন?

হনুমান? না, গাছে তো কিছু নাই। তবে?…কালিকার কথা ভাবিতেছেন? সেই মাথার কাঁটা…?…দৃষ্টি তার ফিরিতে চায় না…

সহসা ও দুই চোখের দৃষ্টি…লজ্জাবতী ঘরের মধ্যে পলাইল। লজ্জায় অনিশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ছি, কি নির্লজ্জের মত সে চাহিয়া ছিল!…তাড়াতাড়ি অনিশ গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।…

সন্ধ্যার সময় নিত্যকার মত আবার সেই আরাম-নীড়…কান্তিবাবুর বাংলা।…কিষণ বলিল—বাবু আর মা-জী তাঁদের এক আপনা-আদমিকা কোঠী'পর গিয়াছেন।…

অনিশের বুকে আঘাত বাজিল—নৈরাশ্যের। আজিকার সন্ধ্যা একেবারেই ব্যর্থ, নিষ্ফল! সে ফিরিতেছিল—সহসা পিছনের দ্বারে করাঘাত শব্দ। অনিশ ফিরিয়া চাহিল। কিষণ কহিল—আপনি বসুন…

অনিশ বসিল—বসিতে বুক কাঁপিল। কিষণ চলিয়া গেল। অনিশ চারিদিকে চাহিল। কেহ নাই। বসাইবার অর্থ…?

সামনের টেবিলে একখানা খাতা পড়িয়া ছিল। সেখানা সে খুলিল। গানের খাতা। মেয়েলি হাতে লেখা—বহু পাতায় লেখা গান। দিদির? না, লজ্জাবতীর?…সে গান পড়িতে লাগিল।

পাশে মৃদু স্বর—বেড়াতে যাবেন না?…

চমকিয়া অনিশ চাহিয়া দেখে, লজ্জাবতী… একেবারে পাশে। অনিশ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—এঁরা?

—কার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।

অনিশ বিস্মিত হইল—চমৎকার কণ্ঠস্বর! স্বরে কোথাও জড়তা নাই, বড় মধুর, মৃদু!…

অনিশ কহিল—এইখানেই একটু বসে গল্প করি না! ওঁরা যদি আসেন…

—ওঁদের দেরী হবে। সন্ধ্যার পর আসবেন···

—তবে চলুন।···কোথায় যাবেন ?

লজ্জাবতী কহিল,—আপনার হাত সেরেচে ?

—সেরেচে।

—দেখি।

আস্তিন গুটাইয়া অনিশ হাত দেখাইল।·· তার পর লজ্জাবতীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল···সোজা নাথনগর রোড ধরিয়া নাথনগর ষ্টেশনের দিকে।···

পথে অনিশ কহিল—ঐটে গোরস্থান।

— দেখতে যাবো।

—ভয় করবে না ?

—না।

তাই হইল। গোরস্থানের মধ্যে খানিক ঘুরিয়া একটা খোলা জায়গায় লজ্জাবতী বসিল। অনিশ কহিল—সেই গানটা শেষ করুন না···

—আপনার ভালো লেগেছিল ?

—খুব।

লজ্জাবতী গাহিল। কিন্তু মুখ তেমনি ঘোমটায় ঢাকা।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনিশ কহিল—আমার একটু নিবেদন আছে...

—বলুন।

—যদি স্পর্দ্ধা না ভাবেন···?

—বলুন না···

—আমার উপর বিশ্বাস করে আমায় আপনাদের আত্মীয় ভেবে এত কথা কইচেন,···কিন্তু···

অনিশের কথা বাধিয়া গেল।

লজ্জাবতী কহিল,—কি ?

—ঘোমটায় মুখ ঢেকে রেখেচেন কেন ?···আমায় যদি বন্ধু বলেই···

লজ্জাবতী একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—লজ্জা করে।···

—এ লজ্জা কেন ?···

আবার একটা নিশ্বাস ! লজ্জাবতী কহিল—কি জানি !

অনিশ কহিল—এই লজ্জা নারীর ভূষণ, মানি ; কিন্তু অনেক সময় ঐ লজ্জাই আবার দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করে···

লজ্জাবতী কোনো জবাব দিল না—বুঝি, কি ভাবিতেছিল ! অনিশও স্তব্ধ। ঝাউগাছগুলার পাতা বাতাসে দুলিতেছিল—একটা শির-শির শব্দ ! এই দারুণ স্তব্ধতার মাঝে ঐ শব্দটুকু···যেন কোন্ ব্যথাতুর প্রাণীর কাতর দীর্ঘশ্বাস !···

অনিশ কহিল—একটা কথা বলবো ? অবশ্য—যদি অভয় পাই···

—বলুন।···

অনিশ কহিল—আপনার বিবাহের ভাবনায় দিদি আর কান্তিবাবু অধীর, কাতর।···আমি একা, নিঃসঙ্গ···আপনাকে এই দু'দিনে কি চক্ষে দেখেচি, তা বলতে পারি না। মনে মনে একখানি ছবি কতভাবেই যে গড়চি আর ভাঙ্গচি, যদি তা না হয় তো আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। বলবেন আপনি ? কোনো সঙ্কোচ না করে ? মায়া নয়, মমতা নয়···নিজের মন বুঝেই বলবেন···নিষ্ঠুরতা হবে না—আমার সে আশা কি দুরাশা·· ?

এই অবধি বলিয়া অনিশ থামিল। কে যেন তাকে চাবুক মারিল ! একান্ত নির্জ্জনে এই কিশোরীকে একাকিনী পাশে পাইয়া ইতরের মত তাঁর অসীম বিশ্বাসের এ সে কি অপমান করিতেছে ! অপরাধের গ্লানিতে অনিশের মন ভরিয়া উঠিল। সে একেবারে লজ্জাবতীর পায়ের উপর

দুই হাত রাখিয়া কহিল—আমায় মাপ করুন, মাপ করুন—আমি ইতর নই, বর্ব্বর নই,—আমি পাগলের মত কি যে সব বকচি…

অনিশের কম্পিত স্খলিত স্বর শত খণ্ডে ঝরিয়া পড়িল। লজ্জাবতী কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। অনিশ কাতরভাবে তার পানে চাহিয়া…লজ্জাবতী শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল; তার পর অত্যন্ত মৃদুভাবে নিজের হাত দিয়া পায়ের উপর হইতে অনিশের হাত সরাইয়া নিজেও একটু সরিয়া বসিল।

গোধূলির ম্লান আলো-ভরা আকাশে এক ফালি চাঁদ…লজ্জাবতী তার পানে চাহিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিল—একেবারে স্তব্ধ, নিশ্চল, ঐ গোরস্থানের মর্ম্মর স্তম্ভগুলার মতই!

অনিশ কাঁপিতেছিল। তার মাথায় আগুনের তীব্র দাহ!…ঐ সে কি করিয়াছে, কি করিয়াছে‥ প্রাণের কতখানি একাগ্র সাধনায় নারীর চিত্তে স্থান লাভ করিতে হয়—আর সে এমন ক্ষিপ্ত, যে ভবিষ্যৎ ভুলিয়া দুম্ করিয়া হঠাৎ…

তার কাণের কাছে কান্তিবাবুর সেই স্বর, দিদির সে ভৎর্সনা যেন বাজের মত গর্জ্জন তুলিল—ওরে বর্ব্বর, ওরে হতভাগা, বিশ্বাস করিয়া এক অপরিচিতা কিশোরীর ভার তোর হাতে দিয়াছিলাম,—এমনি করিয়া সে বিশ্বাসের…

অনিশ শিশুর মত কাঁদিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল!…আর্ত্ত স্বরে কহিল—না, আমি ফিরবো না, লোকালয়ে ফিরবো না আর। এই গোরের মাটীতে এ-প্রাণ যেমন করে পারি মিশিয়ে দেবো…!

সহসা অঙ্গে করস্পর্শ অনুভব করিয়া সে মাথা তুলিল। তার দুই চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপ্‌সা। লজ্জাবতী কহিল—এ কি করচেন! ছি!…

অনিশ বিস্ময়ে বিমূঢ়। কি অদ্ভুত এ বালিকা! রাগ নাই, বিদ্রোহ নাই, এমন মৃদু নম্র শান্ত স্বরে কি এ সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেছে!···

অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে অনিশ কহিল—বলুন আগে, মাপ করেচেন···বলুন আমায়, আজকের এ-কথা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যাবেন—এই গোরের কালো মাটীর তলায় চিরদিনের মত তা চাপা থাকবে? বলুন, তাহলেই আমি লোকালয়ে ফিরবো, নাহলে—

দু'জনেই চুপ! লজ্জাবতী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আমি তাহলে কি করে ফিরবো? একা? দিদি যখন বলবে, আপনি কোথায়···তাঁকে কি বলবো?

আশ্চর্য্য সরলতা! অপরূপ! কি দিয়া এর চিত্ত গড়িয়াছ, ভগবান! এমন করুণাময়ী···

অনিশ কহিল—আগে আমার কথার জবাব দিন···

শান্ত স্বরে লজ্জাবতী কহিল—কি জবাব?

—ঐ যা বললুম···

লজ্জাবতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ওর জবাব তো নেই···

—জবাব নেই! অনিশের স্বরে একরাশ বিস্ময়!

—না।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অনিশ কহিল—কেন, জানতে পারি? ··

লজ্জাবতী মাটীতে একেবারে নুইয়া পড়িয়া কহিল—আপনাকে যেদিন দেখেচি, সেই দিন থেকেই কেমন যেন আমার মনে হয়েচে, যেন···যেন আপনার সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তর ধরে চেনা-পরিচয়···

মাথার উপর সমস্ত আকাশ যদি সেই মুহূর্ত্তে সশব্দে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইত, তাহা হইলেও অনিশ এতখানি বিস্মিত হইত না! সপ্রশ্ন

দৃষ্টিতে অনিশ লজ্জাবতীর পানে চাহিল লজ্জাবতী নত মুখে রহিল বসিয়া···

অনিশ কহিল—দয়া করে বলুন তবে,···আমার এ স্পর্দ্ধা, এ দুরাশা ···আপনি কি যে বলচেন, আমি কিছু বুঝতে পারচি না। এ কি সম্ভব? বলুন, বলুন!

—কি, সম্ভব?

—যে, আমার এ শূন্য জীবন আপনার পায়ের স্পর্শে···

—ছি!

অনিশের মাথার রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। সে যেন উন্মাদ! লজ্জাবতীর দুই হাত নিজের হাতে ধরিয়া আবেগ-স্পন্দিত স্বরে কহিল—তাহলে আমার এ দুরাশা নয়! ওঃ, ভগবান, ভগবান···

লজ্জাবতী কহিল—দিদিকে আপনি বলবেন, নয়তো দাদাকে। আমার বড় লজ্জা করে···

লজ্জা, লজ্জা···ওগো লজ্জাবতী, ওগো মায়াময়ী, মমতাময়ী···সুখী হও! হতভাগ্য অনিশ যেন তোমার এ মায়া, এ মমতার মর্য্যাদা বুঝিয়া চলে!···

ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। পাগলের মত কত কথা যে অনিশ বকিয়া চলিল···এমন ধীর শ্রোতাও মেলে না! উপন্যাসের প্রেমানুরাগিণী নায়িকাও দু'টো নিজের কথা বলে—কিন্তু লজ্জাবতী?···তার আর তুলনা নাই! সমাজে নাই, সাহিত্যে নাই!···

বাংলায় ফিরিয়া ফটকের কাছ হইতে অনিশ বিদায় লইল, কহিল—আমি দাঁড়িয়ে আছি—তুমি যাও।···আমারও বড্ড লজ্জা করচে। কাল কথা কবো। তুমি আজ পারবে না বলতে?...

লজ্জাবতী মৃদু হাসিল। ঘোমটার আড়ালে সে হাসি—যেন মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক !···অপরূপ মাধুরী !···

গৃহে ফিরিয়া শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন···অন্ধকার ঘরে শয্যায় পড়িয়া মুদিত নেত্রে অনিশ রাশি রাশি স্বপ্ন রচিয়া তাই দেখিয়া বিভোর হইল !···

রাত্রির স্তব্ধতা ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল। পাচক আসিয়া আহারের তাগিদ দিল, অনিশ কহিল,—খাবো না।···

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অভিসারিকা

ভৃত্য-পাচক যথারীতি নিজেদের কাজ শেষ করিয়া বিছানা পাতিল। রাত্রি দশটার ট্রেণখানা চারিধার কাঁপাইয়া সগর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়া গেল —তার পর আবার সেই স্তব্ধতা! অনিশ বিছানায় পড়িয়া আছে— একবার তন্দ্রা আসে, বিচিত্র স্বপ্নের দোলা পাইয়া সে জাগিয়া ওঠে,··· তার পর আবাব সেই জাগা আর না-জাগার মধ্যে অস্পষ্ট আব্‌ছায়ার রাজ্যে আশা-নিরাশার চকিত বিভ্রম!···

হঠাৎ দ্বারে মৃদু করাঘাত!···অনিশ উঠিয়া বসিল, বুঝিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল!···উঠিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল—স্বপ্ন? এখনো স্বপ্ন? না, দ্বারে ঐ যে মৃদু করাঘাত! আবার, আবার!···অনিশ কহিল—কে?

কোনো জবাব নাই! করাঘাত! অতি মৃদু, সতর্ক করাঘাত! ধীরে ধীরে অনিশ আলো জ্বালিল, জ্বালিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দেখে, এক নারী···আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃতা।···সে চমকিয়া ডাকিল—লজ্জা!

মৃদু স্বরে মধুর জবাব—আমি।···

সর্ব্বাঙ্গ প্রবল ঝাঁকানিতে নাড়া দিয়া অনিশ বুঝিল, এ স্বপ্ন নয়। সত্যই লজ্জাবতী···তার ঘরে?

কিন্তু একা, এই রাত্রে!···

লাল কুঠির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল।···

অনিশ শিহরিয়া উঠিল, কহিল—তুমি একা—এ-সময়ে এখানে? কারো অসুখ করেনি তো?

লজ্জাবতী ঘোমটার আড়ালে হাসিল, কহিল,—না।...

অনিশ কহিল,—তবে?

লজ্জাবতী কহিল,—আসতে কি নেই? তোমার ঘরে তোমার কাছে...?

অনিশ স্তম্ভিত! এই অসুখ! ঠিক! মাথার রোগ! কান্তিবাবু যে বলেন...ভয়ে সে একেবারে কাঠ হইয়া রহিল।

লজ্জাবতী মৃদু স্বরে কহিল,—সরো...বাঃ! ঘরে ঢুকতে দেবে না বুঝি আমায়?...

যন্ত্র-চালিতের মত অনিশ সরিয়া দাঁড়াইল,—লজ্জাবতী তার পাশ দিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল, কহিল—এটি শোবার ঘর? বই-খাতা ...সে সব?...লেখাপড়ার জন্য আর একটা ঘর আছে, না?...ঐদিকে বুঝি?

অনিশ অবাক! কথাগুলার মধ্যে কোথাও কোনো গোল নাই! এ কেমন উন্মাদ! কিন্তু মাথার গোলযোগ না থাকিলে এমনভাবেও আসে...একা, এই রাত্রে! তাঁরা কি ভাবিবেন?

অনিশ কহিল—চলুন, আপনাকে বাড়ীতে রেখে আসি। কাল দিনের বেলায় এসে সব দেখবেন...

লজ্জাবতী একটু ব্যঙ্গ-ভরা স্বরে কহিল—আমায় আপনি বলা কি! এই বলা হলো, আমি বাড়ীর গৃহিণী হবো, আমায় তুমি বিয়ে করবে—আর এখন এ...কি কথা?

অনিশ নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া। তার হাতের হারিকেনটা লইয়া লজ্জাবতী বেশ সহজভাবে ওদিককার ঘরে চলিয়া গেল।

অনিশ ভাবিতেছিল, এই উন্মাদিনী কিশোরী...নয়ন-ভুলানো নিশ্চয় ...কিন্তু এ আচরণ...এ যে রীতিমত পাগলের কাজ!...কিন্তু যা করুক,

আর যে-কথাই বলুক, মুখের ঐ ঘোমটা···ঠিক আছে! বিচিত্র রোগ! মমতায় অনিশের বুক ভরিয়া উঠিল।

অন্ধকার ঘরে আবার আলোর বিকাশ! লজ্জাবতী আসিল, তার গতি দ্রুত! আসিয়াই হারিকেন রাখিয়া কহিল—দিদি আসচে·· ও বাড়ীর ফটকের কাছে। এখানেই আসসে।·· দিদির ভারী আপত্তি। আমি কথা তুলেছিলুম দাদার কাছে। দাদার মত আছে। কিন্তু দিদি বললে, তোমার না কি আর-একটা বৌ আছে। সে যদি কোনো দিন আসে? যদি তাড়িয়ে দেয়? সে বৌ না থাকতো তো খুব ভালো হতো!···আমি বললুম, তবু আমি বিয়ে করবো।··তা আমায় বকলে, বললে—না।···দাদা তোমার সব কথা বলছিল, শুনেচি।·· থাকুক্ না বৌ ···সে এলে আমরা তাকে তাড়িয়ে দেবো! দেবে না তুমি? দিতে পারবে না? অমন জায়গায়, ঐ গোরস্থানে বসে তুমি বলেচো, আমায় ভালোবাসো···মরা লোকদের সভায় বসে! এখন কোনো কথা কচ্ছ না যে?···

কথা কহিবার অবস্থা তখন অনিশের নয়! এ যেন সে অভিনয় দেখিতেছে! অভিনয়ই···এ সব রীতিমত পাগলের কথা! লজ্জাবতী এমন উন্মাদ, এ তার জানা ছিল না।···তবু মন বলিল, বচনেও কি মাধুরী!

হঠাৎ লজ্জাবতী কহিল—দিদি বকে বললে, বিয়ে হবে না। আমি বললুম, হবে। তাতে দাদাকে বললে,—ভালো করচো না তুমি। চলো বাবু কালই ভাগলপুর ছেড়ে। তাই যাবে, ঠিক করচে। কালই। আমি পালিয়ে এসেচি। আমি যাবো না—কক্খনো যাবো না। তুমি আমার বর। বরকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। কেন যাবো? বরের কাছে থাকবো।

লজ্জাবতীর স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। অনিশ দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল ···এ যেন ঠিক বিকারের রোগীর চরম অবস্থা···

লজ্জাবতী সহসা ব্যস্ত হইল, কহিল—লুকিয়ে রাখো, আমায় লুকিয়ে রাখো—শীগগির। নাহলে ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে।…ঐ বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। ঠিক। তুমি পাশ-বালিশ চাপা দিয়ে দিব্যি বসে থাকো। ব্যবস্থা করো শীগগির। অনেক গল্প করবো পরে; সারা রাত ধরে গল্প করবো, দু'জনে। কেমন? তার পর কানু, চলো, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই—খুব দূরে—কেউ কোনো সন্ধান পাবে না।

কথাটা বলিতে বলিতে ধড়মড়িয়া গিয়া লজ্জাবতী বিছানায় শুইয়া আপাদ-মস্তক চাদরে মুড়ি দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিল। অনিশ নড়িল, দ্বার-প্রান্তে চাহিয়া দেখে, দিদি! আর তাঁর পিছনে কান্তিবাবু,—কান্তিবাবুর হাতে হারিকেন লণ্ঠন।

কান্তিবাবু কহিলেন—জেগে আছেন এখনো! এদিকে সর্ব্বনাশ হয়েচে!

অনিশ কোনো জবাব দিল না। সে ধীরে ধীরে স্বপ্নলোক হইতে আবার মর্ত্ত্যে নামিতেছিল।

দিদি বলিলেন—খেয়ালের ঝোঁকে লাজু কোথায় গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না। শাজঙ্গীতে গেল না কি? কি হবে ভাই অনিশ? এই রাত্তির! দিদি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বিছানার মধ্য হইতে একটা সুস্পষ্ট খিল্‌খিল্ হাসি! সে-শব্দে অনিশ আর নাই! দিদি চমকিয়া চাহিলেন। কান্তিবাবু কহিলেন,—কি ও?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া তিনি চাদের আবরণ টানিয়া দিলেন, অমনি কুণ্ডলী-পাকানো বস্ত্রাবৃতা লজ্জাবতী…! সে খুব হাসিতেছিল। কান্তিবাবু কহিলেন—লাজু! এখানে! এই রাত্রে?

দিদি ডাকিলেন—অনিশ…তাঁর স্বরে অসহ্য ঝাঁজ!…

কান্তিবাবু কহিলেন—এর অর্থ কি?

দিদি কহিলেন—এই কি ভাইয়ের কাজ, অনিশ? ছি! ডাগর

মেয়ে লাজু—তাকে এই রাত্রে তোমার বাড়ীতে দেখচি! বাড়ী কি, তোমার বিছানায়···আর তুমি চুপ করে আছো!

কম্পিত স্বরে অনিশ কহিল—সব কথা বলচি, শুনুন। শুনে আমার অপরাধের বিচার করুন। করে যে-শাস্তি উচিত হয়, কোনো কথা আমি গোপন করবো না···

দিদি কহিলেন—বলো। তাঁর চোখে রোষের বিদ্যুৎ-শিখা!

কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে অনিশ কোনোমতে সন্ধ্যার সমস্ত কাহিনী চিত্রার কাছে খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া চিত্রা কহিলেন,—ওর মুখে কতক শুনেচি। কিন্তু এ যে অসম্ভব, অনিশ।

হতাশ নয়নে অনিশ চিত্রার পানে চাহিল, কহিল—কেন অসম্ভব, দিদি? লাজুকে আমি ভালোবাসি, লাজুও আমায়···

চিত্রা কহিলেন—অধীর হয়ো না, অনিশ। সংসার আর কাব্যের ক্ষেত্র—এ দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ! ভালোবাসাই একমাত্র মানুষকে জীইয়ে রাখে না। তার শক্তি কতটুকু! সংসারে নানা সমস্যা, নানা ঘটনা এসে দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে তুমি তো জানো, তোমার আর এক স্ত্রী আছেন। এঁর মুখে শুনেচি তোমার কথা, তোমার সে দুঃখের ইতিহাস! ইনি এ বিবাহের প্রস্তাবও করেছিলেন। শুনে আমি বলি, কি করে হবে? ওঁর যে স্ত্রী আছেন। তখন উনি সব কথা বলেন···শুনে অবধি বুক আমার ব্যথায় বেদনায় ভরে আছে! কি করবো ভাই? আমি যে কতখানি নিরুপায়!—নাহলে এ তো কামনার বস্তু ছিল··

সজল চক্ষে অনিশ কহিল—কিন্তু আপনি তাহলে শুনেচেন তো সে-স্ত্রীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক···কি দুঃখে আজ আমি ঘরছাড়া,বনবাসী···

—তা হোক! নারীর মন…একদিন সে ছুটে এসে তোমার পাশে নিজের ঠাঁইটুকু দখল করবেই। কাল, নয় পরশু, নয় দু'বছর পরে… তখন?

অনিশ কহিল—বলুন, আমি শপথ করতে রাজী…

নিস্ফলতার আক্রোশে অনিশ ফুঁশিতেছিল।

চিত্রা কহিলেন—না, শপথ নয়। আর-একজন নারীর দীর্ঘনিশ্বাসের সামনে আমার আদরের বোনটিকে দাঁড়াতে দিতে আমি পারবো না… তোমায় সে ভালোবাসে জেনেও…

অনিশ বেত্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, অপরাধের গ্লানির ভারে, নত মুখে।

চিত্রা ডাকিলেন,—লাজু…

খাটে একটা শব্দ! চিত্রা কহিলেন—বাড়ী চলো। ছি,—এমন কাজও করে! ভাগ্যে চাকর-বাকররা শুয়েচে! নাহলে কাল সকালে মুখ দেখানো ভার হতো! বাড়ী এসো…

লজ্জাবতী কহিল—না। তার স্বরে বেশ দৃঢ়তা…আব্দারও!

—যাবে না… কি!

লজ্জাবতী কহিল,—এ আমার বরের ঘর। আমি বরের কাছে থাকবো। এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাবো না…

কান্তিবাবু কহিলেন,—শোনো গো—এমন যখন,…আমি বলি…

চিত্রা কহিলেন—তুমি থামো…অনিশকে আমিও এতটুকু কম স্নেহ করি না…ছোট ভাইয়ের মত দেখি। তবু…

কান্তিলাল কহিলেন—আচ্ছা অনিশ বাবু…এখনো লাজুকে তবু চোখে দেখেন নি—মানে, ওর মুখ। যদি দেখেন, ও কুৎসিত…কুশ্রী? সে-মুখ দেখে যদি শিউরে ওঠেন…?

অনিশ কহিল,—তবুও। আমি রূপকে শিরোধার্য্য করেত চাই না। যদি ওর মুখ দেখে শিউরে উঠতে হয়,···তবু জীবনে-মরণে···

—থামো। মুখ দিয়ে একেবারে নাটকের বুলি বেরুচ্ছে। জীবনে এ বুলির ফল কিন্তু উল্টো হয়! আচ্ছা, ছাখো এর মুখ তুমি আলোটা তুলে ধরো তো গিন্নী···

চিত্রা বিরস চিত্তে কহিলেন—কি যে করো তুমি···

কান্তিলাল কহিলেন,—ছাখোই না কাণ্ড! ওর ঐ পাগলের মুখ দেখলে অনিশবাবুর মোহ কাটতে পারে—এবং···

চিত্রা কহিলেন—বেশ! বলিয়া তিনি আলোটা তুলিয়া ধরিলেন।

কান্তি তখন লজ্জাবতীর মুখের উপর হইতে ঘোমটা সরাইয়া দিলেন, দিয়া কহিলেন,—ছাখো এইবার···

অনিশ চাহিয়া দেখিল··এ কি! দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। এ মুখ···? তার বুক কাঁপিল। এ যে···ঠিক তো! না, কোনো ভুল নয়। এ যে শোভা!···

অনিশ কহিল—শোভা···

কান্তি কহিলেন,—না, লজ্জাবতী। শোভা আবার কে?···

অনিশ কহিল—এর মানে···?

কান্তি কহিলেন—মানে মস্ত···বলতে গেলে বসতে হয় মল্লিনাথ হয়ে!···

কান্তিবাবু তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেন। তারিণীবাবুর মৃত্যুর পর বাড়ীতে যমের সে কি হানা চলিতে লাগিল—রোগের পর রোগ! অসহ্য ব্যাপার! পরে শোভার টাইফয়েড হইল···বুঝি, প্রাণ তার যায়। —বহু কষ্টে সে সারিয়া ওঠে···কিন্তু কেমন যেন পাগলের মত ভাব!··· শ্বশুর-বাড়ী যায়—সেখানে গিয়া অসুখ সারে না। শ্বশুর-শাশুড়ী মহা-

ভাবিত···শেষে কান্তি তাকে নিজের কাছে আনেন। এ বিষয়ে শোভার শ্বশুর-শাশুড়ীর অমত ছিল না। তাঁরা বলেন, যেমন করিয়া পারো, বৌকে সারাইয়া দাও, বাবা। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনিশের খবর লইয়া এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন এবং আগাগোড়া অভিপ্রায় ছিল···

অনিশ কহিল—কিন্তু আপনি ?

কান্তি কহিলেন—তোমার বড় ভায়রা-ভাই। গোড়ামি নেই বলে শ্বশুর-বাড়ীতে হামেশা যেতে পারিনি। তাছাড়া তোমার বিয়েয় আমি মোটে যাইনি। গৃহিণী গেছলেন; দিন পাঁচেক ছিলেন; তার পর আর না, কাজেই দেখাশুনা নেই।

অনিশ কহিল—ভায়রা-ভাই ? কিন্তু তাঁর নাম···

—কান্তি নয় ? ঠিক ! আমার আসল নাম চারু চৌধুরী। রাশ-নাম কান্তি চৌধুরী। গৃহিণীর নাম প্রভা, রাশ-নাম চিত্রা,···ওঁর রাশি হলো মীন। মীনে নামের আদ্যাক্ষর দ আর চ।

অনিশ কহিল—শোভা ! কিন্তু এমন কি তার লজ্জা যে···স্বামী কেউ নয়···আমার অত মিনতিতেও অটল থাকা ! অথচ এখানে এমন···

হাসিয়া চিত্রা কহিলেন—বড় ভুল বোঝো ভাই তোমরা। প্রথম এসে স্বামীর কাছে আমরা যখন দাঁড়াই, তখন এ জ্ঞানটুকু নিয়েই আসি যে এ-লোকটি তো আপন-জন আছেই—এঁকে পাবার জন্য যাগ যজ্ঞের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন দরকার, তাঁর আশে-পাশে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের চিত্ত জয় করা···তা করতে পারলেই সংসারে সুখ পাবো। বাঙালীর সংসার শুধুই স্বামী-স্ত্রীর সংসার নয়···সে যে বিরাট অতিথ-শালা···তার চার্জ্জ নিতে বহু বুদ্ধির প্রয়োজন।···তুমি যদি ধৈর্য্য রাখতে, এটুকু তাহলে···

হাসিয়া কান্তি ওরফে চারু কহিল—জীবনে এত-বড় নাট্য রচনা না হলে এ সত্য বোঝবার অবসরও পেতে না ! এই বেশ হলো…নয় কি ? কত-বড় বৈচিত্র্য, বলো দিকিনি…!…হলা শ্যালিকে…ইস্, উনি আবার বলেন, আমার বরের বাড়ী, এ বাড়ী ছেড়ে যাবো না ! নিমকহারাম, বেইমান ! ভেবেচেন, elope করবেন তরুণের সঙ্গে ! কালের হাওয়া গায়ে লেগেচে, না ?…সাধে কবি বলেচেন, Frailty, thy name is Woman !

—যাও ! বলিয়া হাসিয়া শোভা গিয়া একেবারে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

অনিশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যে-শোভাকে বুক হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, ভুলিয়াও যে-শোভার পানে আর কখনো ফিরিয়া চাহিবে না বলিয়া কঠিন পণে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছিল, সেই শোভাই অবশেষে ঐ লজ্জাবগুণ্ঠনের অন্তরাল দিয়া এমন অবাধে তার বুক অধিকার করিয়া বসিয়াছে ! শোভার প্রতি বিরূপতায় যে-মন পরিপূর্ণ ছিল, আজ সে-মন…! এ যে একেবারে আরব-রজনীর কাহিনী ! এ কি সত্য…?

চিত্রা কহিলেন,—কি ভাবচো, অনিশ ? নতুনকে সেই পুরোনো মূর্ত্তিতে দেখে অন্তরে আবার বিদ্রোহ জাগচে নাকি ?

কান্তিলাল কহিলেন,—সাহিত্যিকের পক্ষে এ বিদ্রোহ জাগা অনুচিত। যেহেতু ওঁদের গুরু বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী-চৌধুরাণী'র উপসংহারে দেবীকে ডেকে বলেচেন,—'এখন এসো প্রফুল্ল, একবার লোকালয়ে দাঁড়াও, আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন ! আমি সেই বাক্যমাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং···অর্থাৎ বিড়ম্বিত অনিশবাবুর পরিত্রাণের জন্যই পুরাতন শোভার এই নূতন লজ্জাবতী-বেশে আসার প্রয়োজন ছিল! আন্‌কোরা নূতন লজ্জাবতী এলে সাহিত্য হয়তো সমৃদ্ধ হতো, কিন্তু নায়ক অনিশবাবুর জটিলতার অন্ত থাকতো না! অনিশবাবু এবার রাহুমুক্ত হলেন! একটিমাত্র পত্নী এই অধম দীন পুরুষ-জাত্‌কে কি দারুণ অভাব, অপদার্থতা, আর অসহায়তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে; তা আমার মত সাধূত্তম পুরুষ চিরদিন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবে!

চিত্রা কহিলেন,—বঙ্কিমকে Quote করলেও তুমি থামো···

কান্তিলাল কহিলেন,—থামবো নিশ্চয়। যেহেতু আমাদের উভয়ের এখন যবনিকান্তরালে যাবার সময় এসেচে। এঁরা উভয়ে আমাদের সান্নিধ্য এখন বিষবৎ পরিত্যাগ করতে চান্। কিন্তু যাবার আগে একটি অনুরোধ, এসো লাজু, একবার অনিশের পাশে এসে দাঁড়াও—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমরাও বলি, তুমি নূতন নও, পুরাতন,—যুগে যুগে তুমি আসচো সাধু-স্বামীর পরিত্রাণের জন্য···নব নব রূপে, নব নব বেশে, গৃহে গৃহে···প্রেমিকা, সেবিকা, সচিব, সুখীমিথঃ···

চিত্রা ডাকিলেন,—শোভা···

কান্তিলাল কহিলেন,—শোভা! ও-নামে হয়তো অনিশ বাবুর হৃদয়ের ক্ষত স্থানে···

বাধা দিয়া চিত্রা কহিলেন,—শুধু ধৈর্য্য! এই ধৈর্য্য না থাকলে কত বুক যে শ্মশান হয়ে যেতো···

কান্তিলাল কহিলেন,—নিশ্চয়! আমি তার প্রমাণ দিতে পারি। মোদ্দা, আমি নিশ্চিত জানতুম, অনিশবাবুর কেশ্ হাতে নেওয়া ইস্তক যে, আরাম করবোই। তরুণ চিত্ত···তার সামনে রূপসী তরুণী শ্যালিকা, তাঁর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন এবং মৌনতার মোহ···

চিত্রা কহিলেন,—আমরা যাই, চলো···কাল সকালেই অনিশবাবুর মাকে চিঠি লিখবো,—তাঁর পুত্র-পুত্রবধূর কুশল-সংবাদ দিয়ে।

অনিশ শোভার পানে চাহিল,—উল্লাসের উচ্ছ্বাসে সে যেন উন্মাদিনী! চিত্রা তাকে টানিয়া তুলিলেন, তুলিয়া স্নেহ-ভরে তার অধরে চুম্বন করিয়া কহিলেন—লজ্জা নারীর ভূষণ। কিন্তু অতিরিক্ত ভূষণে দেহ যেমন প্রপীড়িত হয়, অতি-লজ্জার ভারে মনও তেমনি পীড়া পায়,—এ কথা মনে রাখিস্, ভাই!

কান্তি কহিলেন,—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং, জানো তো! আপাততঃ বিদায় নি, অনিশবাবু,—আপনাদের মিলন-মহোৎসব আপনারা সুসম্পন্ন করুন। লাস্যে, ভাষ্যে, হাস্যে, দাস্যে, আপনি স্বামিকুলের গৌরবস্বরূপ হোন্! এ নব-যাত্রায় আপনাদের জীবনের পথ শুভ হোক্, শিব হোক্, সুন্দর হোক্, প্রীতিকুসুম-দলে সে পথ বিকীর্ণ থাকুক! কাল ভোরে এসে তোমাদের মধু-যামিনীর কাহিনী সবিস্তারে শুনবো।

চিত্রা ও কান্তি বিদায় লইলেন।

শোভা খাটের প্রান্তে বসিয়াছিল, যেন চিত্রার্পিত মূর্ত্তি! অনিশ আকাশের দিকে চাহিল, জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে!

শোভার দু'খানি হাত নিজের হাতে লইয়া অনিশ কহিল,—আমায় মাপ করেচো, শোভা?

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া শোভা কহিল,—না, শোভা নয়। শোভা মরেচে। আমি লাজু, লজ্জাবতী। এখন থেকে আমায় লজ্জাবতী বলেই ডেকো।

শেষ

—এই লেখকের লেখা অন্য বই—

উপন্যাস

পিয়ারী	...	২৲	কাজরী...২য় সংস্করণ	১॥০
কুজ্ঝটিকা	...	২৲	মধুযামিনী ...	১॥০
আঁধি	...	২॥০	কালোর আলো ...	১॥০
রূপছায়া	...	২৲	ছোট পাতা ...	১॥০
মুক্ত পাখী	...	২৲	দরদী...২য় সংস্করণ	১৲
বিনোদ হালদার	...	২৲	সোনার কাঠি...২য় সংস্করণ	১৲
নিশির ডাক	...	২৲	প্রেয়সী...৪র্থ সংস্করণ	১৲
বহ্নিশিখা	...	২৲	মমতা ...	১৲
গরীবের ছেলে	...	২৲	শান্তি ...	১৲
স্ত্রীবুদ্ধি	...	১৸০	মাতৃঋণ ...	১॥০
নিরুদ্দেশের যাত্রী	...	১॥০	নবাব ...	২॥০
বাবলা	...	১॥০	বন্দী...২য় সংস্করণ ...	১৲
নেপথ্যে	...	॥০	পথের পথিক ...	।৵০
লাল ফুল	...	যন্ত্রস্থ	নারী ...	যন্ত্রস্থ

ছোট গল্প

তরুণী	...	২৲	পুষ্পক ...	১৲
যৌবরাজ্য	...	১॥০	শেফালি...২য় সংস্করণ	১৲
পিয়াসী	...	১।০	নির্ঝর...২য় সংস্করণ ...	১৲
মৃণাল	...	১।০	পরদেশী...২য় সংস্করণ	১৲
মণিদীপ	...	১৲	বৈকালি ...	॥০
চাঁদমালা ...২য় সংস্করণ		১৲		

নাট্যগ্রন্থ

লাখ টাকা · আর্ট থিয়েটারে অভিনীত ...	১৲
হারানো রতন ··নাট্যমন্দিরে অভিনীত ...	।৶০
যৎকিঞ্চিৎ...ষ্টারে অভিনীত	॥০
দশচক্র······ষ্টারে অভিনীত	।৶০
গ্রহের ফের···কোহিনুরে অভিনীত	।০
দরিয়া···মিনার্ভায় অভিনীত	॥০
রুমেলা...মিনার্ভায় অভিনীত	॥০
শেষ বেশ...ষ্টারে অভিনীত	।৵০
পঞ্চশর...ষ্টারে অভিনীত	।৶০
হাতের পাঁচ···মিনার্ভায় অভিনীত	।৵০

লাল কুঠি ··সচিত্র উপন্যাস	১।০
পাঠান মুল্লুকে ·· ,, ...	১।০
মা-কালীর খাঁড়া... ,, ...	১।০
সাঁঝের বাতি (ছবি ও গল্প)	॥০
ফুলের পাখা...(,, ,,)	॥০
তারার মালা···(,, ,,)	॥০

সকল গ্রন্থই **গুরুদাস লাইব্রেরী**, কলিকাতা ; ও অন্য পুস্তকালয়ে ; এবং কলিকাতা, ৮২।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারে নিকট পাওয়া যায়।